উ প ন্যা স

বিরবাসিনী

নাসরীন জাহান

জানালার ওপরে নিউবর্ন পাখিদের কিচিরমিচির। নিঃসীম প্রায় পলকহীন চেয়ে আছি। প্রাণের মধ্যে থরকাঁপুনি।

ভেসে যাওয়া করুণ সুরের মতো কন্যার কথাগুলো বাতাসে উড়তে থাকে।

তুমি আমার জন্মের শত্রু।

তোমার রক্তমাংসে হিংসা।

তীব্র শোকে আমার শরীর হিম হয়ে ওঠে।

কেন হিম হই ? কেন থরকাঁপুনি ? কেন আমার অভ্যাস হয় না ওর এই নিত্যকার আচরণে।

এই বোধই নিজেকে নিজের মধ্যে ক্রমশ খাড়া করায়। যেন আলো নয়, আমি একাকী বসে আছি গাঢ় আঁধারের উল্লাসের মাঝে।

অলংকরণ আরিফুল ইসলাম

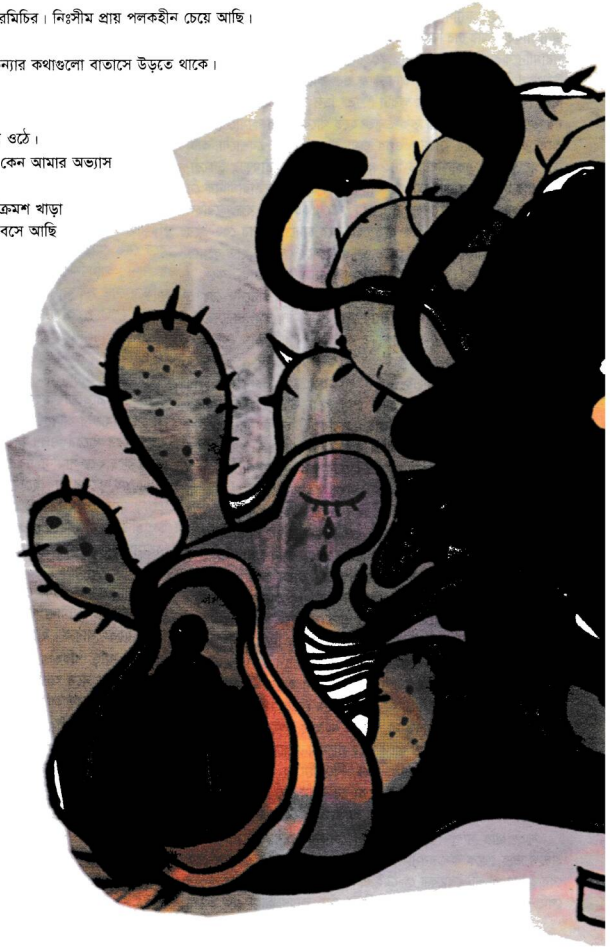

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যা, মানে মিতুল আজ যুদ্ধ শুরুই করেছিল যথারীতি আমার সুন্দর রূপকে তাক করে। বলেছিল, নিজে একটা সুন্দর রূপ নিয়ে পেটে ধরেছিলে আমার মতো কুৎসিতকে। শুনেছি তো দাদুর কাছে, আমি পেটে থাকতে ঘরে একটা সুন্দর বাচ্চার ছবিও টাঙাও নি।

আঁধার উল্লাসের পথ ধরে আমি ওর গর্জন থেকে পালাতে থাকি।

ভাবনার বীজ ফুঁড়ে প্রস্ফুটিত হয় মা'র কথা। আমার জন্মের সময় বাবার নাকি খুব ইচ্ছে ছিল ঘরে একটা ছেলে আসুক।

মেয়ে জন্ম দিয়ে মা যখন চরম অস্বস্তিতে বাবা আমাকে টেনে কোলে নিয়ে বলেছিলেন, এত সুন্দর মেয়ে থাকতে ছেলে কে চায়? মেয়ে আমার বিশ্বসুন্দরী হবে।

আর কোনো ভাইবোন না হওয়ায় বাড়িতে রাজকন্যার মতো ঘুরতাম। প্রবল সুখে ঘুম এসে যেত চোখে। কী সুন্দর রৌদ্রগান, কী সুন্দর লাবণ্য লহরী, কী সুন্দর উড়ে আসা রঙধনু, সেই আমার কল্পনার ঘুণাক্ষরেও এই ভাবনা আসে নি যে, জীবন আমাকে জবাই করে টুকরো টুকরো অবস্থায় ভবিতব্যের মধ্যে ফেলবে?

শূন্যতায় মাথা কুটেও কিচ্ছুর দিশা মেলে না।

সৌম্য কান্তিময় বাবার চেহারাটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, সঙ্গে যুগলভাবে মা'র সুন্দর মুখটাও। এত প্রগাঢ় প্রেম ছিল দুজনের, একজনের মুখকে আলাদা করে ভাবা যেত না। আমি তখন চারপাশে আমার সৌন্দর্য নিয়ে সুন্দর সুন্দর কোরাসের মাঝে নিয়ে বড় হচ্ছি। শুনতে ভালো লাগলেও এত বেশি বেশি যে বিরক্ত লাগত। ফলে যখন সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আমার নাম দেওয়ার প্রশ্ন এল, আমি সশব্দে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিলাম। কম বয়স থেকেই নিজের প্রাইভেসির ব্যাপারে আমি অনড় ছিলাম।

চুপ মেরে আছ কেন? আমাকে চমকে দিয়ে মিতুলের গলা উচ্চকিত হলো। তুমি কেন আসল কারণটা বলছ না? কেন গেলে আমার স্কুলে? মিতুল হাঁপাতে থাকে, খুব আনন্দ হয়েছে না? আমাদের টিচাররা তোমার রূপের প্রশংসা করছিল। আর ওই হ্যান্ডসাম টিচারটা যার ওপর তুমি হামলে পড়ছিলে...?

মিতুল? চিৎকার করে উঠি। আর একটা কথা বললে তোমাকে থাপ্পড় দেব।

হিংস্র জন্তুর মতো বিকট আওয়াজে সে আমার বুকের কাছে এসে বসে আমার হাত দুটি নিয়ে বলে, মারো থাপ্পড়, মারো। মেরে জীবনের মতো শেষ করে দাও, এই কুত্তার জীবন আর ভালো লাগে না।

আমি কাঁদতে থাকি।

মিতুল নিশ্চুপ তাকিয়ে থেকে আচমকা হাত দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দেয়, তুমি আমার কষ্টটা বুঝবে না। কতজন যে জিজ্ঞেস করে উনি তোমার আসল মা তো? আমার কেমন লাগতে পারে, আন্দাজ করো?

আমি বুঝি, বুঝিরে ওর মাথা বুকে নিয়ে হালকা চাপড় দিই।

২

তাৎক্ষণিকভাবে আমার প্রতি তার এই সহানুভূতি এত দুর্লভ, এমন সময় এলেও ভেতরে গুরুগুরু আতংকের কালো মেঘ গুমড়ায়, এই বুঝি ইউটার্ন নিয়ে আমার ওপর হামলে পড়ল। যে-কোনো সময় যে-কোনো ইস্যু ধরে ফের শুরু করল। আমাকে অভিসম্পাত করাটা তার নেশা হয়ে গেছে।

নিজেকে মনে হয় কলে পড়া জন্তু। জানালায় তাকাই, সামনের সবুজ মুছে যায়। যেন ঘিরে আছে জৈষ্ঠর বজ্রপাত, পচে ফুলে ওঠা মরা হাতির দল, রক্ত বিবর স্রোত, মসলাহীন সেদ্ধ মাংস। কালো কালো রঙধনু। বুকে ক্ষত দিয়ে কড়া রোদে শুয়ে থাকা ভিখিরি। বাঁশির মধ্যে বিউগলের চিৎকার। এইসব ফুঁড়ে আমার শরীর কাঁপিয়ে গন্ডারের মতো দেখতে মন্টুর চেহারা ভেসে আসে।

ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছি অনেক। তা আমার জন্য তেমন ক্ষতিকর হয় নি বিরক্ত লাগা ছাড়া। কিন্তু মন্টু... দাঁতে দাঁত লেগে যায় সেই দিনগুলো মনে পড়লে। যেন বিশালাকার রাক্ষস হাতে আমার দুপা ওপরে উঠিয়ে উল্টো হয়ে থাকা আমার চামড়া ছিলছেই। আর তার হাসি, উফ কী ভয়ংকর!

মিতুল তার ঘর থেকে আসে—কী হয়েছে মা?

কই কিছু না তো।

মনে হলো কিছু দেখে ভয় পেয়েছ।

থ্যাংকস মা। কিচ্ছু না।

ও আবার কেয়ারিং হয়ে আমার খোঁজ নিতে এসেছে? অভিভূত বোধে আমার কান্না পেতে থাকে। একটি বাড়িতে দুজন প্রাণী খুব জরুরি ছাড়া আর কোনো স্বাভাবিক কথা হয় না। তর্জন গর্জন ছাড়া এই বাড়ির চেহারার কথা ভাবাই যায় না।

জন্মের পর আমি ওর মুখ দেখে প্রায় জ্ঞান হারিয়েছিলাম। হুবহু মন্টুর মুখ। পর্যায়ে পর্যায়ে অনেক ঘটনার পর সহজাত প্রভাবে মাতৃত্ব প্রগাঢ় হলো।

আমার কন্যা নিজেকে ভয়ংকর কুৎসিত জানে।

তার দু চোখের বিষ আমার রূপ।

অথচ একসময় ওকে আমি নাড়তে-ঘাঁটতে ওর মুখের মধ্যে একটা অস্পষ্ট মায়াবী আদল পেয়ে যাই। যেন আমার বাবার অস্পষ্ট ছায়া। এটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এত যুদ্ধ তিক্ততার পরও ওকে আমি এত ভালোবাসি, ওর জ্বর হলে আমার নিউমোনিয়া হয়।

আমি মাঝে মাঝে নিমগ্ন হয়ে তার চেহারার ভেতরটার দিকে আকুলভাবে তাকাতে চাই।

আমাকে চমকে দিয়ে বলে, আমাকে শুয়োর না পেঁচার মতো লাগছে তা-ই মাপছ?

মিতুল প্লিজ! তুমি কিচ্ছু স্বাভাবিকভাবে নিতে পারো না?

হাঃ হাঃ শ্লেষ কণ্ঠে হাসে মিতুল, যে বাড়িতে একসঙ্গে রাক্ষসী আর রানী বাস করে সে ঘর স্বাভাবিক কী করে হবে?

তোমার মুখের ভেতর অদ্ভুত মায়াবী একটা ছায়া আছে... বলতেই চিৎকার করে ওঠে, হাজার বার বলছি না আমাকে প্রবোধ দিয়ো না। আমি কি বাচ্চা? বুঝি না কিছু? বলে হনহন হেঁটে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

রাতের পর রাত আমার কাটে চাদর খামচে, তুলোয় আঙুল আঁকড়ে। রাত বাড়তে থাকলে দেয়ালে কত যে ছায়া পড়ে। রোজ রাতেই একটা শীতকুকুর তীব্র শীতের মধ্যে কী যে করুণ সুরে কাঁদত! দেখি, মিতুল কুকুরটার গায়ে একটা গরম কাপড় দিয়ে যেই ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে, আমি বললাম, ভালো করেছিস। ওর কান্না এত করুণ, সহ্য করা যায় না।

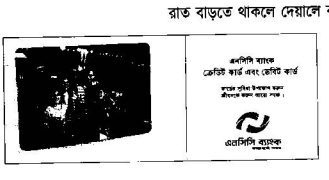

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুল ঝাঁজিয়ে ওঠে, আমি একা এই, তোমারও কুকুরটার জন্য কষ্ট হচ্ছে না ? তোমাকে সবটাতে জিততে হবে ?

করোটিতে জোড়া পাখির উড়াল। চারপাশে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা হৃদয়ের ঘুলঘুলিতে হাত উড়াল করে শান্তনু। আমার মামাতো ভাই। ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়ি থেকেছে। মিতুল একমাত্র তাকে পছন্দ করে।

ঢাকা থেকে সুদূরে চলে আসার পর যোগাযোগ কমে গেছে। শান্তনু আর আমি যখনই বুঝতে পারলাম আমার রূপ নিয়ে মিতুলের ভেতর কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে, তখন পরামর্শ করে ঠিক করেছি শান্তনু যেন ওর সামনে আমাকে বেশি পাত্তা না দেয়। তাই একমাত্র শান্তনুর সঙ্গে মিতুলের গভীর খাতির। ফেসবুকে ওরা কথা বলে। শান্তনুর জোকস শুনে মিতুল হেসে গড়াগড়ি খায়।

কি এমন বলছে শান্তনু ?

মেয়েকে কবে হাসতে দেখেছি, এটাও তো মনে পড়ে না আমার। আমি বলি, আমারই হয়তো দোষ, আমারই বিচ্যুতি আছে, মেয়ের সঙ্গে কীভাবে মিশতে হবে জানি না।

চ্যাটিং হচ্ছিল।

শান্তনু লেখে, না না, দোষ তোমার না। আমি একটা রহস্যের জট কিছুতেই খুলতে পারি না। তোমার প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ হয়ে যায়, মাঝে মাঝে বলে, আমার মা অনেক নাটকবাজ। মা বান্ধবীর সঙ্গে একদিন বলছিল শুনেছি, আমার বিয়ের প্রতি স্বাদ মিটে গেছে। বান্ধবী যখন আরও চাপ দিল, বলল মিতুলকে নিয়ে ভাবতে হবে না ? তখন বলল, ওকে নিয়ে কীভাবে বিয়ে করব ?

তার মানে আমার জন্য বিয়ে করতে পারছে না। আর ওপরে ওপরে দেখায় নিজের রূপ নিয়ে, পুরুষ নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই।

সারা ঘরে ফিনকি ওঠা ছায়া। এক তিতকুটে বোধ মগজে ঘাপটি মেরে থাকে। আমার অস্তিত্ব কেবল ব্যর্থতা প্রসব করে। ব্যথায় নুয়ে গিয়ে বলি, আমার অবাক লাগে, ওর দাদা-দাদু ওকে এত ভালোবাসে, ও আমাকে ছেড়ে ওদের কাছে যেতে চায় না কেন ?

সেটাও বিশাল বিস্ময় এক, শান্তনু লেখে। ও মনে করে তোমার ওখান থেকে ও চলে গেলে সুন্দর একটা পুরুষ দেখে তাকে তুমি বিয়ে করে ফেলবে। তার মতো কুৎসিত মেয়েকে জন্ম দিয়ে নিজে পরীর মতো উড়ে বেড়াবে তা কিছুতেই হবে না।

সুইচ অফ করে দিই।

আমার নিঃশ্বাসের মুখে একটা পাথর এসে বসে। এ কি জীবনের মধ্যে পড়লাম আমি ? অনার্সে কত ভালো রেজাল্ট ছিল। মন্টুর মৃত্যুর পর ধুঁকে ধুঁকে এমএ-তেও খারাপ করি নি। কত ভালো একটা চাকরি হতে পারত, কত ভালো জায়গায়। কিন্তু মন্টুর সঙ্গে আমার ব্যাপারটা পত্রপত্রিকায় ফলাও করে এসেছিল। মিতুলের জন্মের পর সেটা আবার চড়াও হয় 'সেই মন্টুর কন্যা হয়েছে, দেখতে মন্টুর মতো' এ জাতীয় কাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে আমি বান্দরবানে চলে আসি।

অন্যমনস্কের মতো ঘরদোর গুছিয়ে জানালার কাছে বসি। সার সার পাহাড় যেন ধাই ধাই করে উড়ছে।

এখানে এসেও ভয়ে ছিলাম। কিন্তু লক্ষ করলাম আমার জাতীয় খবর নিয়ে এখানে কেউ বসে নেই।

জন্মের পরেই ওর মুখে সেই মায়াবী আদলের ছায়াটা ছিল না। কেবল মন্টুর মুখ। আমি উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে পড়েছিলাম। ওর গলার দিকে আঙুল চলে যেত পর্যন্ত।

মা আমাকে বাঁচালেন। কয়েক মাস বলা যায় তিনিই মিতুলকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিলেন।

ধীরে ধীরে আমি ধাতস্থ হয়ে আসি।

আমি নিজেকে ওর সঙ্গে জড়াই স্নেহের ঘ্রাণ ছাড়া। ধীরে ধীরে ওর মুখে ওই মায়াবী প্রচ্ছায়াটা প্রগাঢ় হয়।

মিতুল যদি এমনিতে এমন কুৎসিত হতো, ওকে প্রথম থেকেই প্রাণে জড়াতে আমার একবিন্দু দ্বিধা হতো না। কিন্তু যে মন্টুর জন্য আমার পরান আজও কষে কষে রক্তডানার উড়ালে জাপটাত কন্যা সেই মুখটা পাওয়ায়...হে আল্লাহ সারা জীবনের জন্য তুমি আমার জীবনে কী তুলে দিলে!

৩

যখন আমার সুন্দর রূপ আমার জন্য বিষ হয়ে ওঠে নি, তখন প্রায়শ নার্সিসাসের মতো আয়নার সামনে বুঁদ হয়ে থাকতাম। রাজপুত্র টাইপের কেউ আসবে জীবনে এটাও ভেতরে গুঞ্জরিত হতো।

তখন সবে এইচএসসি পাস করে অনার্সে ভর্তির জন্য ছুটছি। আচমকা একদিন পাড়ার পুরাতন মাস্তানদের মাঝখানে ইয়া লম্বা বিকট এক মাস্তানকে দেখলাম।

আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

বলে, হেই মাইয়া ভালোই তো রূপসী হইছ। তুমারে দেইখ্যা আমার মাথা ঝিমঝিম করতাছে। বলো, কবে আমাদের বিয়া হইব ?

সেই প্রথম।

এরপর সকাল-সন্ধ্যা আমাদের বাড়ির চারপাশ চক্কর দিয়ে 'মিলি মিলি' বলে ডাকত। ওর অবয়ব এত ভয়ংকর ছিল, ওর বদলে আমি কোনো বাঘের সামনে দাঁড়াতেও এত ভয় পেতাম কি না সন্দেহ।

একদিন দলবল বেঁধে ঘরে ঢুকে বাবার কাছে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব রাখল।

বাবা তার ঘাড় ধরে দরজার দিকে ধাক্কা দিলেন। পরদিন বাবার সঙ্গে কোচিং সেন্টারে যাব বলে ট্যাক্সি ভাড়া করছি, কয়েকটা হাত ছোঁ মেরে আমাকে তাদের গাড়িতে নিয়ে ছুটতে শুরু করল।

আর ভাবতে পারি না।

নিজে নিজেই চমকে উঠি।

চারপাশে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে অসীম হুতাসনে ডুবে কী জানি কেন কান্নায় আমার চোখ ভিজে আসে। এই আমি বাবা-মা'র কত আরাধ্য সন্তান ছিলাম। বিয়ের পনেরো বছর পর আমার জন্য তাদের নক্ষত্রের ডালি ভরে দিয়েছিল।

আমি ক্লাস টেনে উঠার আগে আগেই মা আমার সঙ্গে সব গল্প করতেন।

বাবা মায়ের বড়ভাই মানে মামার বন্ধু ছিলেন। দুজনের কী কঠিন প্রেম! বাবা পড়াশোনায় ভালো, পরিবারও মন্দ ছিল না, এজন্য তাদের বিয়ে হতে তেমন বাধার পাহাড় ডিঙাতে হয় নি।

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি বাবাদের একটা হরিহর আত্মা বন্ধু গ্রুপ আছে। কেউ ছোটবেলার, কেউ কলেজজীবনের। এর মধ্যে একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে আইভি আন্টি নাকি কলেজে থাকতে বাবার গভীর প্রেমে পড়েছিল। এই দলটা এক হলে কার্ড খেলতে বসে। পানীয়র আসরও হয়। সবচেয়ে মজার শওকত চাচা। হই হই করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে।

জানালা দিয়ে কি ছাতিমের গন্ধ আসছে ? বাবা-মা'দের স্মৃতি থেকে সামান্য সরে সচকিত হই। বাতাসের কেশরে দোলরত গাছের পাতারা। অদ্ভুত এক সোঁদা গন্ধে বুঁদ হয়ে ফের ডুবে যাই বাবা-মা'র স্মৃতির মধ্যে।

বাবা-মা'র প্রেমময় জীবনের মধ্যে একবারই ঝড় উঠেছিল। আড্ডা যখন তুঙ্গে তখন শওকত চাচা আচমকা উঠে মা'র কাছে গিয়ে পুরো মাতাল অবস্থায় মা'র গালের তিলটা দেখিয়ে বলে, তোমার এই তিলটা আমাকে সব সময় টানে, বলে মা'র গালে চুমু খেয়ে বসে। মা হতভম্ব। সবাই চুপ হয়ে যায়। বাবা উঠে এসে ওকে থাপ্পড় দিয়ে বলে, বেরিয়ে যা হারামি, অসভ্য কোথাকার!

সবাই মিলে শওকত চাচাকে নিয়ে বাইরে চলে যায়।

বিষয়টা এখানে শেষ হলে হতো। কিন্তু বাবা যখন সারা জীবনের জন্য শওকত চাচার সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানার সিদ্ধান্তে অনড়, তখন মা বাগড়া দিয়ে বলে, তোমরা স্কুলজীবনের বন্ধু। ও মাতাল হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক থাকলে এটা করত ? যা হয়েছে ভুলে যাও।

তুমি তাকে সাপোর্ট করছ ? বাবা আসমান থেকে পড়েন।

এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বিষাক্ত পর্যায়ে গেলে বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। যেতে যেতে বলেন, আর ফিরব না। চুমু খাওয়ার লোক আমারও কম নেই।

মা! দরজায় মিতুল।

আমি হন্তদন্ত হয়ে বসি।

তোমার কাছে পিরিয়ডের প্যাড হবে ? আমার শেষ হয়ে গেছে।

ভাগ্যিস ছিল।

ওকে ওটা দিতে দিতে প্রশ্ন করি, পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন ?

ভালো, বলে ধীরপায়ে চলে যায় সে।

আত্মার মধ্য দিয়ে যেন দমকা বাতাস বয়ে যায়। মায়া লাগে মিতুলের জন্য। কী করবে বেচারি! স্কুলে ভর্তি হলে কেউ তার সিটের পাশে বসতে চাইত না। 'ভূতের বাচ্চা' বলে বলে কেউ ক্ষেপাত। খুব ছোট যখন আমার বুকে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কাঁদত। আমি আর স্কুলে যাব না।

আমি হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলে কিছু একটা ব্যবস্থা করলেও, কেউ কেউ তার পাশে বসলেও কথা বলত না।

একটা প্রলম্বিত নিঃসঙ্গ জীবনের ফেরে পড়ে দিশাহীন বোধ করত মিতুল। কী তার দোষ ? কেন তার চেহারা এমন হলো ?

তখন ক্লাস টেনের এক বজ্জাত মেয়ে তাকে কোনায় ডেকে বলে, দুজন মানুষের শরীর মিলনে সন্তান হয়। তোমার মা জঙ্গলে গিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে শরীর মিলন করেছিল। তাই তুমি এমন হয়েছ।

একটা বাতাস উঠেছে। দেবদারুর পাতাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে বাতাস ঠান্ডা পশলা এনে আমার দেহ-পরান ভিজিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে বৃষ্টির নহর বইতে থাকে। যেন মহাগম্ভুজের ওপার থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসে।

হইচই করা পাখির ডানার সংগীতে চারপাশ মুখরিত।

দরজায় শব্দ।

এই বৃষ্টিতে ? ভাবতে ভাবতে ছিটকিনিতে হাত দিই, আরে নীলু তুমি ? ঢাকা থেকে কবে এলে ?

আজকেই, আরে সামনে থেকে সরো বাপ, গোসল হয়ে যাচ্ছি যে।

ওকে টাওয়াল দিয়ে ফুরফুরে মন নিয়ে বলি, আমারও একা একা দম আটকে আসছিল। ভাগ্যিস তুমি এসেছ।

ঘরে বৃষ্টির ছিটা আসছে। জানালা ভিজিয়ে নীলুর হাত থেকে টাওয়ালটা নিয়ে আমিই মুছিয়ে দিতে থাকি, তা এদ্দিন লাগল যে ? তোমার না আরও আগে আসার কথা ছিল।

আর বোলো না, দাদু হঠাৎ অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

যে কাজে গেছিলে, হয়েছে ?

এত সহজ ? এসব কথা থাক, এ নিয়ে এমনিই মেজাজ তিতিক্ষি হয়ে আছে।

ইলেকট্রিসিটি চলে যায়।

ধেৎ, নীলুর কণ্ঠের এই সুতো ধরেই ড্রয়ার হাতড়ে মোমবাতি বের করি।

যথারীতি নীলু লাইটার এগিয়ে দিয়ে সিগ্রেট বের করে বলে, এইবার মৌজ করে কষে একটা টান দিই। আলোর প্রচ্ছায়া ঘরটাকে কারুকার্যময় করে তুলেছে। বৃষ্টির শব্দ টিনের চালের মধ্যে এমন নূপুরের ধ্বনি বাজাচ্ছে, দেহমন রোমাঞ্চিত হয়ে যায়।

মিতুলের কী খবর ? ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে নীলু।

কেউ বলবে এই বাড়িতে দুটো লোক আছে ? বলেই পল্টি খাই, ওর প্রসঙ্গ বাদ দাও। মোবাইল নিয়ে পড়ে আছে।

আশ্চর্য লাগে, বাস্তবে সে কারও সঙ্গে মিশতে পারে না। ফেসবুকে সে মুখর।

ওর প্রোফাইল পিকচার দেখেছ ? প্রশ্ন করি, কোত্থেকে যে জোগাড় করেছে এই সুন্দর মুখ—বলতে বলতে আমার চোখ ভিজে ওঠে। আহা! সুন্দর হওয়ার কত স্বপ্ন মেয়েটার। যদি পারতাম আমার মুখের সঙ্গে ওরটা বদলে নিতাম।

মানোচিকিৎসকের কাছেও তো যেতে চায় না, নীলু বলে, মুশকিল তো ওইটাই।

নীলু একটা বালিশ কাঁধে নিয়ে বিছানার স্ট্যান্ডের সঙ্গে আধশোয়া হয়।

আমার কণ্ঠ মৃদু উচ্চকিত, বলে আমাকে পাগল ভাবছ ? তোমার ডাক্তার কি আমার চেহারা বদলে দিতে পারবে ? তাও ভাগ্য ভালো নাক-থুতনির আশপাশে চুলগুলো পরিষ্কার করতে শিখেছে। ছোটবেলায় তো ওখানে ছোঁয়াই যেত না। এ জন্য ইশকুলে তাকে এতটা কষ্টকর পরিবেশে পড়তে হয়েছিল। বলতে বলতে আলো-আঁধারময় ঘরে দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিই।

নীলুর বাবার বদলির চাকরি ছিল। বান্দরবান আসার পর এখানকার প্রকৃতি-মানুষের এত প্রেমে পড়ে যান, কিছুতেই এখান থেকে আর বদলি নেন নি। জায়গা কিনে চার রুমের সুন্দর একটা টিনের বাড়ি বানিয়েছিলেন। অন্য সব ভাইবোনেরা নানা জায়গায়। বাবার আত্মাটা নীলুও পেয়েছিল।

নীলুরা যখন ময়মনসিংহে, তখন আমার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। ওরা নানা জায়গায় বদলির মধ্যেও চিঠি দিয়ে, ফেসবুকে আমাদের যোগাযোগ অটুট রয়েছে। পত্রিকায় আমার খবর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে সে রীতিমতো টেনে আমাকে বান্দরবানে ওর ওখানে নিয়ে যায়। তার সোর্স ধরেই আমি এখানে স্কুলে একটা চাকরি পাই। মাটির পাঁজর ফুঁড়ে ধুলোগন্ধ চারপাশে ছড়ায়িত। চোখ বুজে তন্দ্রাচ্ছন্ন আমার চোখ মোমের দর্পিত শিখার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় কবিতা লিখতাম ডায়রিতে।

আলোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করি।

উচাটন রোদ্দুর এসে কড়া চোখে ছাই করে দেয় শিশির কুণ্ডলি। চরাচরের হাহাকার গিলে খায় বুভুক্ষু সমুদ্র। ঝরাপাতা মিনতি জানায় বাতাসকে। আর উড়িয়ো না আমাকে।

কে কার কথা শোনে!

কেবল স্বস্তির জয়।

গিয়ে বসি ছায়াঘেরা বটের পায়ের কাছে।

আচমকা ঘূর্ণি এসে আমাকে কোন পাতালে নিয়ে যে ফেলে!

আমি কই ?

সত্যিই নিজেকে হাতড়াতে থাকি, আমি কই ?

কিরে মন্ত্র পড়ছিস ? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে নীলু। ওর সিগ্রেটের ধোঁয়া আমার নাকে কটু গন্ধ ছড়িয়ে আঁধারময় ঘরে বুদবুদের মতো উড়তে থাকে।

তোর কথা ভাবছিলাম। যেভাবে তোর ঢাকার আত্মীয়রা তোর বিয়ে খুঁজতে লেগেছে, কবে যে আমাকে অথই শূন্যে ফেলে তুই চলে যাস।

বিশ্বাস কর, আমার বিয়েতে একটুও ইচ্ছে নেই। তাই বলে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে তাবৎ পুরুষকে আমি খারাপ ভাবব তেমন টিপিক্যাল আমি নই। বিয়ে প্রেম এসবের মনটাই কেন জানি মরে গেছে।

বিয়ে তো করবিই। আমার একাকিত্বের জন্য তোকে আটকানোর কথা ভাবব, এত স্বার্থপর আমি হতে পারি ?

৪

আমাকে তুলে নিয়ে মন্টু যেন মহাশূন্যের ওপারে গিয়ে থেমে ছিল। মুখ বাঁধা অবস্থায় কত ঘন্টা যে জার্নি করেছি আন্দাজ করা কঠিন।

চারপাশে পাহাড়। চারপাশে কবরের স্তব্ধতা। ব্যথায়-যন্ত্রণায় বিবমিষাময় অনুভূতিতে আমার জীবন্মৃত অবস্থা। সারাক্ষণ একটা পিস্তলের ভয় দেখিয়ে গেছে। আমি ভয় পেয়েছিও। যেন আগুনে ঝলসানো গ্রীষ্ম প্রবাহের বালির মধ্যে আমি ডুবজল খাচ্ছিলাম।

ওই অবস্থাতেই প্রথমেই সে একটা কাজী নিয়ে আসে, বলে আমারে যত অসভ্য ভাব তা আমি নই। আমি তুমারে ভালোবাসছি। তাই বিয়া করা ছাড়া আমার কাছে আমি তুমারে রাখুম না।

দুদিকে দুজন আমাকে ধরে রেখেছে। বন্দুক তাক করে কবুল বলিয়ে সে বিয়ের কাজ সারল।

সারা দিন অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলল। ওদের আখড়ার মেয়েদের দিয়ে গোসল করিয়ে নতুন কাপড় পরাল। ক্ষুধায় মানুষ কেমন বুভুক্ষু হয় সেদিন বুঝেছি, টানা দুদিন না খেয়ে, খাবার আসতেই পৃথিবীর সব ভুলে আমি হামলে পড়ি।

শরীরটা যখন অনেকটা ঠিক লাগছে, ফুলশয্যায় এসে ওই রাক্ষসটা 'ওই সুন্দরী ওই সুন্দরী' করতে করতে আমার রূপের কিছুকে গ্রাহ্য না করে

আমার দেহের মাংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবচেয়ে মারাত্মক তার কামড়, যেখানে যেভাবে পারল আমার মুখ চেপে ধরে কামড় দিয়ে গেল।

দিনেরবেলায় সবাই সে দাগ দেখতে পেত। পুরো এক মাস প্রতি রাতে সে এমন ভয়ংকর কাজ করত আর সকালে উঠে মাফ চাইত। আর তার সনাতনি ভঙ্গি, আমার দুহাত টেনে নিজের গালের কাছে নিয়ে বলত, আমারে মারো, মারো তুমি।

আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম একদিন, পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করব।

তখনই পুলিশ এলাকাটা ঘেরাও করে ফেলে। মন্টু পালিয়ে যায়।

একটা ঘোর ট্রমার মধ্যে ডুবে যাওয়া আমাকে জড়িয়ে বাবা-মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তুই কই ছিলি মা ? এই এক মাস আমরা মরে মরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঁচেছি। কামড়ে ঘা হওয়া শরীরের জন্য আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তখনই ধরা পড়ল, আমি মা হতে চলেছি।

স্কুল থেকে বাড়ি কাছেই। এইটুকু পথ হাঁটতে আমার ভালোই লাগে। ক্লাস শেষে কিশোরীদের মতো পা দিয়ে পাতা উড়িয়ে উড়িয়ে ফিরছি, আচমকা স্ট্যাচু হয়ে যাই। একটা গোখরো আমার সামনে ফণা তুলে আছে।

মন্টুর ওখানে থাকার সময় আমার সত্তায় যেমন বোধ হতো সাপটার সামনে দাঁড়িয়ে সর্ব অস্তিত্বে সেই বোধ অনুভব করছি। আমি বলা যায় নিঃশ্বাসহীন দাঁড়িয়ে থাকি। সাপের সামনে থেকে এক কণা নড়াও বারণ, আমি জানি। কিন্তু আমি থরথর কাঁপছিলাম। যেন কম্পমান রাত্রি, যেন বুনোবাতাসের পিঠে হাঙ্গর উড়ছে, যেন সব মৃতেরা আত্মার বিলাপ গাইছে, যেন বজ্র থেকে ইয়া লম্বা জিহ্বা এসে আমার মাথায় পতিত হয়েছে।

সহসা চারপাশ আঁধার হয়ে আসে। আমার মনে হয়, সাপটা আমাকে ছোবল মেরেছে আর আমি মরে যাচ্ছি। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিয়ে লাফাতে থাকি। এত নির্জন রাস্তা। কারও খবর নেই। কিছুক্ষণ পর ধাতস্থ হয়ে অনুভব করতে পারি, আমার স্ট্যাচু অবস্থাতেই সাপ মাথা নামিয়ে চলে গেছে। ছুটতে ছুটতে ঘরের দরজায় পা রাখতেই কন্যা দরজা খুলে দেয়। আমি তখনো কাঁপছিলাম।

কী হয়েছে মা ?

ওর কণ্ঠের নরম পেলবতায় সব ভয় সব কাঁপুনি উবে যায়, বলি, আমার সামনে একটা গোখরো সাপ পড়ে গেছিল।

মেয়ের চোখ গোল গোল, তারপর ?

কীভাবে যে বাঁচলাম, বলে আবেগে মেয়েকে বুকে টানি, সে ছিটকে যায়, আমাকে ছুঁয়ো না, আমার পচা ছোঁয়া তোমার সুন্দর শরীরে লেগে যাবে।

মৃদু ধমক দিই, মিতুল! আমার কী দোষ ? কেন আমাকে আঘাত দিয়ে তোর এত আনন্দ ? তুই একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখিস তো ? তুই আমার প্রতি অবিচার করছিস কি না ?

আমি অবিচার করছি ? একটা কুৎসিত লোকের সঙ্গে শোয়ার জন্য তুমি তাকে বিয়ে করেছ। তুমি হিংসুটে। চাইতে না সুন্দর বাচ্চা হোক। নিজে জিতে দিব্যি আছ। তোমার সঙ্গে বেরোলে সবাই জিজ্ঞেস করে আমি কার বাচ্চা। তুমি বুঝো আমার কষ্ট ?

এক ঝটকায় দরজায় টান দিয়ে নিজ ঘরে চলে যায় মিতুল।

নীলু আমাকে কয়েকবার বলেছে, তুই ওকে তোর আসল ঘটনা বলে দে। ওখান থেকে দূরে আসায় ও কিছু জানতে পারে নি। এবার এইচএসসি দেবে, খুব তো ছোট না এখন আর। তুই না বললে কে বলবে ? আত্মার সেতু ভেঙে পড়তে চায়, বলি, ও আমার কথা বিশ্বাস করবে না।

তাহলে আমি বলি ?

না, না এ ঝুঁকি এখন নেওয়া যাবে না। ওর পরীক্ষাটা শেষ হোক। এরপর ভাবা যাবে কী প্রক্রিয়ায় কী করা যায়।

৫

সন্ধ্যাবেলায় কষে জ্বর উঠল।

নীলু চট্টগ্রামে গেছে। বমি বমি বোধ, মাথা ঘুরানো...আমি চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। গায়ে কাঁথা মুড়ি। একটানা শুঙিয়ে যাচ্ছিলাম।

একটা গ্লাস পড়ে যাওয়ার শব্দ হয়। সেই শব্দের ধ্বনি সোডার মতো আমার দেহের কোষে ছড়াতে থাকে। একরাতের মতো দীর্ঘ একটি সন্ধ্যার পথ ধরে যেনবা আমি ক্রাচ ধরে এগোই।

আচমকা আমার গর্ভকালীন অবস্থার স্মৃতি মনে পড়ে। তখন শিশু, শিশুর হামা দেওয়া, তার বিকৃত আকৃতি চারপাশে চক্কর খেত। মনে হতো পেটে মানুষ নয় ডাকিনী পুষেছি। যে-কোনো সময় পেট ফুঁড়ে তার দীর্ঘ হাত-পা বেরিয়ে আসবে।

আমার স্পষ্ট বিশ্বাস ছিল, আমার পেট থেকে আরেকটা মন্টু বেরোবে। দেখতে আরও ভয়াল ডাকাত আকৃতি হবে তার। কী বিশাল দাঁত! কালো রক্ত।

অস্তিত্ব জুড়ে পোকা হাঁটছে। কী বিচ্ছিরি দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নিজেকে চিনি না, জানি না।

যেন কত শতাব্দী পর জিতুর মুখটাকে আমার মুখের ওপর ঝুলতে দেখি।

জিতু! জিতু! আমাকে শূন্যে ফেলে কোথায় পালিয়েছিলে তুমি ?

জিতু বলে, তুমি অমন ফ্যাকাসে শাদা হয়ে যাচ্ছ কেন ?

শৈশবের সেই নীতুকে মনে পড়ে। শাদা হতে হতে নীতু মৃত্যুর ঘনকালোর মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। এক গভীর অনুভবের নিমজ্জনে দেখি এক উপজাতির মেয়ে জননী হলো। শিশুটির জনক ছিল এক প্রকৃতি। মেয়েটি ঘুমিয়েছিল, পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক তিরন্দাজ। মেয়েটিকে কাঁপিয়ে, নিজে কেঁপে পথের তিরন্দাজ পথেই হারিয়ে যায়। কেবল মেয়েটি জানল প্রকৃতি মেয়েটির জনক।

গভীর রাতে বাদুড়ের মতো মিশমিশে কালো আর দৈত্যের অবয়বের এক শিশু ঘন জঙ্গলে জন্ম দিয়ে মেয়েটি শহরে চলে এল।

আমিও পালাতে চাই। দেহের মধ্যে কী কারণে কেন জানি অনেকটা আরাম হওয়ায় আমি চোখ মেলি। আমার বুকের ভেতরটা প্রগাঢ় মায়া, প্রগাঢ় বিস্ময়ে ভরে ওঠে।

মিতুল আমাকে জলপট্টি দিচ্ছে। বলে, বৃষ্টিতে ভিজে ইশকুলে যাতায়াত করলে হবে না ? মাগো! একেবারে পুড়ে যাচ্ছিলে।

আমি ওর একটা হাত ধরে চুমু খাই।

আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি, তার আগে পাড়ার হরিকে দিয়ে একটা স্যুপ আনিয়েছি, খাও।

ছন্দে বাজে জল নূপুর। আসমান ভেসে সাঁতরায় বুনো পাখিরা।

বলি, আমার বমি লাগছে, এখন কিছু খাব না। আর এখন অনেকটা ভালো লাগছে, ডাক্তার লাগবে না।

সব সময় তুমিই ভালো বোঝ, না ? বলে বাটির স্যুপটা আমার মুখে তুলে দেয়।

আমি যে স্বর্গদ্যানে ঘুরছি, মিতুলরে, তুই যদি সব সময় এমন থাকতি ?

খুব সাবধানে থাকি, এখন যেন এমন কোনো বিষয় কিছুতেই না ঘটে, যাতে ও তিতকুটে হয়ে ওঠে।

খারাপ লাগলে আমাকে ডেকো, বলতে বলতে মেয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

ভালোলাগা বোধে আমার চারপাশে এমন সুন্দর তীব্র বাতাস উঠে যেন জাকির হোসেনের তবলা বাজছে।

ঘাই দিয়ে ফের নীতুকে মনে পড়ে। হায় কতকাল ভুলে ছিলাম তাকে।

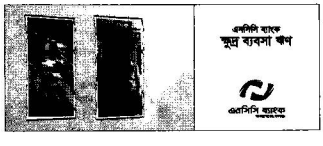

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কৈশোরের সবটা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল যে আমার বন্ধু। আমি ওকে শাদা হয়ে হয়ে মরে যেতে দেখেছি। নীতু ভয় পেত অন্ধকার। আমি দেখেছি কী সীমাহীন অন্ধকারে তাকে নামানো হলো। নীতু আমাকে শিখিয়েছিল, একটি বিড়ালের মৃত্যুও কত কষ্টের। পথ না চিনলেও ছুটতে ছুটতে অনেকদূর চলা, তারপর পথ খুঁজে দিনকে ছায়া করে ঘরে ফিরে বাবার শাসনকে ক্ষুদ্র করে দেখা নীতু শিখিয়েছিল। সেই বয়সেই আলেক্সান্দার বেলায়েভের 'উভচর মানুষ' আমাকে পড়িয়েছিল। পড়ে কত যে কেঁদেছিলাম। উভচর ইকথিয়াস্তরের বেদনায় নীতুও কত যে নীলচে থাকত। একটি ফড়িং ধরেছিল সে, এত আলতো ভঙ্গিতে, ফড়িং নিজেই যেন টের পায় নি তার ডানায় দু আঙুলের প্রতিবন্ধকতা। উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, আল্লাহর কাছে যা, গিয়ে বলিস আমি দোযখকে খুব ভয় পাই।

আজকের দিনে ফের আমি বিমর্ষতায় ডুবছি ?

৬

হেই জিতু।

রিকশা থেকে হাত উঠাই।

হনহন করে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে ক্যাঙ্গারু লাফে এসে রিকশায় আমার পাশে বসে, কোথায় যাচ্ছ ?

শপিং-এ। কিছু জরুরি জিনিস কেনার আছে।

আজকে বাদ দিলে হয় না ? কাতর মুখে বলে জিতু, চলো অন্য কোথাও গিয়ে বসি।

আরে, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। একসঙ্গে শপিং করলেই তো একসঙ্গে থাকা হলো।

শপিংয়ে একসঙ্গে থাকা আর কোথাও বসে প্রাণের কথা বলা এক হলো ? জিতুর মুখে বিষাদের ছায়া খেলে যায়।

অতঃপর রিকশা ঘোরাই।

চারপাশে সূর্যের কোমল স্ফটিক আলো ছড়ায়িত। জিতুকে যেন রঙধনুর সাতরঙ এসে বহুবর্ণ করে রেখেছে। ওর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতে গিয়ে দেখি জিতুই নিষ্পলক আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বলে, সৃষ্টিকর্তা তোমাকে আলাদা সময় নিয়ে বানিয়েছেন।

চারপাশে গাড়ি, রিকশার হুজ্জোত। রিকশা যানজটে আটকে আছে।

মাথা উচ্চকিত করি। রূপ রূপ! আমার যেন আর কিছু নেই। যে রূপ তৈরিতে আমার কোনো হাত নেই। এই যোগ্যতায় আমার ভূমিকা নেই, সবাই এটা নিয়েই বলে, কেন আমার নিজের কোনো যোগ্যতা নেই ?

কম্পিত হাতে জিতু আমার হাত টেনে নেয়। এই জন্যই তোমার অতল প্রেমে ডুবে থাকি। সুন্দরী মেয়েদের রূপ নিয়ে কত অহংকার। তুমি একেবারেই আলাদা। ফের রিকশা চলতে থাকে।

আস্তে আস্তে আকাশটা ছায়ামগ্ন হয়ে উঠতে থাকে। বাতাসের ফিতে বেয়ে কোত্থেকে যেন হাস্নাহেনার ঘ্রাণ ভেসে আসে।

আমি চোখ বন্ধ করি।

বলি, আমি যদি দেখতে সুন্দর না হতাম, তাহলে তুমি আমাকে ভালোবাসতে ?

রিকশা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়ায়, কই যামু ? ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে।

কোথায় বসতে চাও ? জিতুর প্রশ্ন।

তুমি কোথাও বসতে চাইছ, তুমিই ঠিক করো।

এ বাংলায় প্রেমিক-প্রেমিকার বসার জায়গা নেই, হাহাকার ঝরে পড়ে জিতুর কণ্ঠে।

তুমি সামনের দিকে যেতে থাকো, রিকশাওয়ালাকে কথাটা বলে জিতুর দিকে ফিরি আমি, বললে না ?

তুমি দেখি দিব্যি ভুলে বসে আছ আমাদের প্রথম দেখা রূপ না অন্যকিছু নিয়ে হয়েছিল ?

ধূসর ঘুলঘুলির অতলে তলিয়ে যাই।

সেদিন আমি বড় রাস্তায় রিকশা ধরে যাচ্ছিলাম। আচমকা গাড়ির ধাক্কা খেয়ে বাঁচার আকুতি জানাচ্ছিল ছেলেটা। সবাই ভিড় করছিল, কেউ তাকে ধরছিল না।

আমি এক লাফ দিয়ে ভিড় ঠেলে ছেলেটির একটি হাত ধরে রিকশাওয়ালাকে অনুরোধ করি আরেক হাত ধরতে। আমার দেখাদেখি ছেলেটার আরেকটা হাত ধরে একটা কিশোরও রিকশায় আমার পাশে বসে। পেছনে কে যেন বলে, এত্তোগুলান পোলা থাকতে মাইয়াটা যা দেখাইল!

ভিড় রাস্তা যানজট ঠেলে রিকশা এগোচ্ছে। আর আমার কোলে রক্তাক্ত মাথা রেখে রিকশার নিচ দিকে পা দিয়ে রেখেছে ছেলেটা।

আমার শরীর ভেঙে আসছিল।

যেন রিকশায় নয়, ছেলেটি ট্যানেলে চিৎসাঁতার দিয়ে রেখেছে। ওর গোঙানি মুহুর্মুহু আর্তনাদের মতো শোনায়। ছেলেটি যদি মরে যায় ?

আমার মাথা ক্রমশ ফাঁকা হয়ে আসছিল। লোকগুলোর কোরাস কানে বাজছিল, মাইনসের উপকার কইরা নিজের মরণ কে ডাকে ? পুলিশে ধইরা জীবনটা হারাম কইরা দিব, কী কইরা হইল, সম্পর্ক কী ? এরপরে রেগুলার থানায় লেফট রাইট।

না, এগুলো আমার প্রচ্ছায়ায় বিন্দুমাত্র আঁধার ফেলছিল না। তবে এমন একটা ভয়াবহ কাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করে বুকের ভেতরটা হিমহিম অনুভব করছিলাম।

এরপর হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে জ্ঞান ফেরার অপেক্ষা।

কোথায় হারালে ? জিতু আমাকে মৃদু ধাক্কা দেয়।

আমি নিমজ্জন থেকে উঠে আসি, তোমার অ্যাক্সিডেন্টের কথা মনে করছিলাম।

এরপরেও বলবে আমি তোমার রূপ দেখে প্রেমে পড়েছিলাম ? তুমি নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করলে, থানা-পুলিশ করলে, আমি অভিভূত হয়ে তোমার ভেতর মানুষটার সৌন্দর্য দেখছিলাম।

কই যাইবেন ?

চলো একটা চীনা রেস্তোরাঁয় বসে স্যুপ খাই। টানা ঘোরের মধ্যে থাকায় আমার অস্তিত্ব যেন শূন্যে হাল ধরতে চায়। আমার বাড়ানো হাত মুঠো করে ধরে জিতু, কী করছ ? পড়ে যাবে তো!

ঝাপসা চোখ প্রসারিত করি। পুরো শহর কি মৃত্যুশয্যায় হেলান দিয়েছে ? আমার মাথা ঘুরছে কেন ?

আমাকে জাপটে ধরে রিকশাকে এগোতে বলে জিতু। এরপর একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্মেসির সামনে। ডাক্তার আছেন দেখে নেমে আমাকে প্রায় পাজাকোলা করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়।

ডাক্তার যখন প্রেসার চেক করছিলেন, আমি বলি আমার কিচ্ছু হয় নি। একটা ভাবনার মধ্যে ডুব দিয়েছিলাম তো।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলেন, প্রেসারের ওষুধ খান তো ?

না।

এখন থেকে রোজ খাবেন। প্রেসার অনেক বেশি। খাওয়ার আধা ঘন্টা আগে অথবা এক ঘন্টা পরে। জিতু আর কী কী সব কথা বলে আমার কানে যায় না।

একসময় স্মৃতির নিমজ্জন থেকে বেরিয়ে আসি।

৭

মেয়ের সঙ্গে কয়েকটা দিন ভালোই যাচ্ছিল। ফের সেতুহীন উত্তাল নদীতে নিমজ্জন ঘটল। মিতুলের হঠাৎ পেটে ব্যথা শুরু হলো। নিজ দায়িত্বে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিলাম। কিন্তু কমার লক্ষণ নেই। পরে রিকশা ডেকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। সেখানে আরও লোক ছিল। ডাক্তার যখন চেক করে যথারীতি একজন প্রশ্ন করে, ও আপনার কে হয় ?

আমার রোমকূপ শিরশির করে, অস্ফুটে বলি, কন্যা।

আপনার কন্যা ? বেফাঁস হয়ে ওঠে লোকটি। ওর বাবা কি ওর মতো দেখতে ?

আপনি থামবেন ? আমি মৃদু ধমক দিয়ে এক সময় মিতুলকে বাসায় নিয়ে আসি।

ততক্ষণে ডাক্তার মিতুলকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছেন। লোকটি তখনো ড্যাবড্যাবে চোখে কখনো মিতুল কখনো আমাকে দেখে যাচ্ছে।

আমার ভেতরটা হিম হচ্ছিল, এই ব্যাপারটা নিয়ে মিতুল এরপর কী করে, তা নিয়ে।

যা ভেবেছিলাম।

পুরো রাস্তায় মুখে কুলুপ এঁটে বাড়ি ঢুকে মৃদু কণ্ঠে মিতুল প্রশ্ন করে, এইসব মুহূর্তগুলি তুমি খুব এনজয় করো, না ?

কোন সব মুহূর্ত, ইচ্ছে করেই ভান করি।

আহা যেন জানো না, মিতুলের কণ্ঠ উত্তপ্ত হতে থাকে। তোমার এই ন্যাকামোগুলি আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঘরের বাতিগুলো ফিউজ ফিউজ ভাব। ঘরটায় ছায়াচ্ছন্নতা। যেন আলোহীনতা নয়, চারপাশ ঘিরে আছে বিষাদের ছায়া।

আমি নিশ্চুপ বসে থাকি, পুরুষগুলো তোমাকে এসব বেশি বলে, আমি নিশ্চিত তুমি ভেতরে ভেতরে মজা পাও, তো বসে আছো কেন, একটা বিয়ে করে ফেললেই পারো।

মিতুলের কণ্ঠের ঝাঁজ ধরে অসহিষ্ণু হয়ে উঠি, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না মিতুল, এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো। তুমি জানো না তোমার সঙ্গে কারও সামনে যেতে চাই না আমি ?

মিতুল ফের তেতে উঠে, তাও তুমি আমাদের ডাক্তার কাকুকে ফোন না করে আমাকে বাইরে নিয়ে গেলে কেন ?

ডাক্তার কাকু দেশে নেই। কলকাতা গেছে, কণ্ঠে জোর দিয়ে বলি, তো আমি যখন নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আপত্তি করো নি কেন ?

ব্যথায় আমার মাথা ঠিক ছিল না, ফুঁসে ওঠে মিতুল। এরপর একেবারে ভেঙে পড়ে, কেন আমাকে জন্ম দিলে ? জন্মের পর মুখে নুন দিলে না কেন ?

অসীম হুতাশনে ঘরের প্রচ্ছায়া কাঁপতে থাকে। এই মেয়েটার জন্য আমার এক কণা সাজগোজ করা তো দূরের কথা, মাথাভর্তি তেল দিয়ে বেণি করে রাখি। অথচ বোঝার বয়সের পর থেকে আমাকে কাজল আর টিপ ছাড়া কেউ দেখে নি।

আত্মার বুনোবাতাসের তোড়ে সব সুখ-ফুর্তি উড়ে যায়। হু হু কম্পমান রাত্রি। নিজের জীবনটাকে একেক সময় শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে।

তাও পারি না। ওর দাদা-দাদি বুড়োবুড়ি। অ্যাক্সিডেন্টে আমার মা-বাবাও মরে গেছে। মিতুল যে ভেসে যাবে।

লোকগুলো যখন অমন কথা বলে তুমি থাপ্পড় না দিয়ে মিন মিন করো কেন ? বললাম না তুমি এনজয় করো।

মিতুল। কড়া কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠি, ফের ওই এক কথা ? চেহারাটা খারাপ হয়েছে বলে মুখটাও সারাক্ষণ খারাপ রাখবে নাকি ?

বলেই টের পাই দেহের রক্ত স্ট্র দিয়ে টেনে নিচ্ছে কেউ।

হুংকারে ফেটে পড়ে মিতুল। বিছানা থেকে লাফিয়ে দাঁড়ায়, এই তো বেরিয়ে এসেছে আসল রূপ। তুমিও পাক্কা জানো, আমার চেহারা খারাপ। অথচ কতবার বলেছ, আমার চেহারায় একটা মায়া আছে। একমাত্র তুমিই সেটা দেখতে পাও। তুমি আমাকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য, মন রাখার জন্য এদ্দিন এসব বলেছ ?

আমি ওর তড়পাতে রাখা হাত-পা ধরতে ব্যর্থ হই, আমি ওটা মিন করি নি মা...।

মা ? রক্তচক্ষু মিতুলের, আবার ভোলানোর চেষ্টা করছ ? তুমি একটা বিষ, একটা শয়তান, এই জন্যই তোমার কপালে কোনো ভালো লোক জুটে নি।

আমার গলা এবার চড়ায়, তার মানে তুই স্বীকার করছিস তোর বাবা একটা খারাপ লোক ?

আমার বাবার কী দোষ ? হাঁপাতে থাকে মিতুল। তুমি প্যান্টশার্ট পরে পথেঘাটে বাবাকে উস্কাতে। মাস্তান টাইপের সাহসী ছেলে পছন্দ করতে, দাদু আমাকে সব বলেছে, বাবাও তোমার রঙ সঙে ভুলে গিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পর যখন দেখলে বাবা মাস্তানি ছেড়ে দিয়েছে, তার হাত শূন্য, তখন তুমি তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছ।

তাহলে এখন কই তোর বাবা ? আমি যদি এতই বিষ, তুই চলে যা না তোর বাবার কাছে ?

আমি গেলেই তো সুবিধা, মিতুলের কণ্ঠ বিকৃত হয়ে ওঠে। তোমার দেওয়া আঘাত পেয়ে বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে দাদা-দাদুর কত কষ্ট। তুমি আমাকে উল্টাপাল্টা বুঝাবে আর আমি বুঝব ? তুমি যদি নিজের ঢং দেখিয়ে ওই লোকটাকে বিয়ে না করতে, আমার এই দশা হয় ? তোমার যতই অসহ্য লাগুক, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। আমি নিজে খাঁচায় বন্দি হয়ে তোমাকে আকাশে উড়তে দেব না।

তোর বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে নিয়ে আসল সত্যটা যদি তুই জানতি, আমি ধপাস বিছানায় বসে পড়ি। তীব্র বেদনার রশ্মি আমার সর্বাঙ্গ আঁটো করে প্যাঁচাতে থাকে।

হাঃ হাঃ বিদ্রূপ করে মিতুল। আরেকটা গল্প বানাবে। এদ্দিন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেহারা নিয়ে মনভুলানো কথা বলেছ, আজ তোমার ভেতর থেকেও বেরিয়ে এল আসল সত্যটা... কান্নায় মিতুলের কণ্ঠ ভিজে আসে। পৃথিবীর হাজার লোক হাজার কথা বললেও তোমার ওই কথাটা আমাকে আত্মায় শান্তি দিত। আমি তোমাকে বুঝতে দিতাম না, বলে ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় মিতুল।

জাগরিত রাত্রিতে বালিশ আঁকড়ে অঝোরে কাঁদি। এ কী করলাম আমি!

মিতুলের চেহারা নিয়ে আমার এই অনুভবকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল সে ? স্তব্ধ বোবাময় বোধ করি। সে তো ঘুণাক্ষরেও তার এই অনুভব আমাকে বুঝতে দেয় নি। আমি রাগের মাথায় এত বড় আঘাত দিয়ে ফেললাম ? কান্না চেপে পাশের রুমে ছুটে যাওয়ার দৃশ্যটা যতবার চোখে ভাসে থাপ্পড়ে নিজের গাল দুটো লাল করে দিতে ইচ্ছে করে।

তার মানে ওর ভেতর আরও এমন অনেক বিষয় লুকিয়ে আছে ? মেয়েটাকে আমি চিনি বলে যে দাবি করি তা ঠিক না ?

পাশের ঘর থেকে টেলিফোনে হেঁচকি দিয়ে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

নিশ্চিত শান্তনু। মিতুলের জীবনের একমাত্র ওয়েসিস শান্তনু। গোপনে আমার সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে শান্তনু জানায়, মিতুলের সঙ্গে রোজ কথা হয় তার। স্কুলে, ঘরে মিতুল কী করে, কী করে তার দিন সময় কাটায়, সব শেয়ার করে।

শান্তনুকে সে বন্ধু বলে ডাকে।

আমি মিতুলকে অসুন্দর বলেছি, এটা শুনে নিশ্চিত শান্তনু অবাক হবে, ক্ষিপ্তও হবে। আগামী মাসে শান্তনু আসছে শুনে মিতুলের সে কী আনন্দ! আমাকে গম্ভীরমুখে বললেও সে তার ভেতরের খুশিটা লুকাতে পারে না। পাশের ঘরে মিতুলের কান্না থিতিয়ে এসেছে।

এরপর মেয়েটাকে কী করে মুখ দেখাব আমি ?

এইভাবে বাঁচা যায় ? আমার পুড়ে যাওয়া রক্তাভ দেহ ঘাই দিয়ে ওঠে। আব্বা-আম্মার কথা মনে পড়ে। আমি পালিয়ে থাকি ওদের ভাবনা থেকে। আজ অঝোরে চোখ ভিজে ওঠে।

তারা থাকলে মিতুলকে নিয়ে একাকী আমার ডুবজল খেতে হতো না।

মিতুলের মুখের মায়া নিয়ে যে অনুভবটা বলেছিলাম মিতুলকে, চিরদিনের জন্য ওর অবিশ্বাসের খাতায় তা লেখা হয়ে গেল।

বালিশ ভিজিয়ে উঠে বসি।

জানালার পর্দা খুলে দিয়ে আঁধার অরণ্যের দিকে চেয়ে থাকি। অস্ফুটে ঠোঁট নড়তে থাকে, ভেতরে কান্নার স্রোত, প্রলম্বিত রাত্রি তার কিনারা খুঁজতে থাকে। চোখের পাপড়িতে কোনো ভার নেই। শুকুনিরা আমার ওপর শূন্যতায় ওড়াওড়ি করে।

সুদূরে হারিয়ে যাওয়া আব্বা-আম্মাকে স্মরণ করে বালিশ ভিজিয়ে দিই।

আত্মজার বুকে আজ নিজ অজান্তেই পেরেক ঠুকেছি। বোবা বোধে দম আটকে আসে।

বিকট জাগরণ অজগর হয়ে আমাকে কষে প্যাঁচিয়ে ধরে।

স্বপ্ন ধাই উড়াল দিয়ে রঙধনু ছুঁতে চায়।

রঙিন চৌকস নখ দিয়ে সাপটার জিভ বিদ্ধ করতে চাই।

সাপ কই ?

তবে কি আমারই নির্ঘুম ভার আমাকে জাপটে ধরেছে ?

কতকাল পর আজ আকুল হয়ে কাঁদি।

নিজেকে বাঁচাতে দাঁতে দাঁত চেপে টানতে টানতে শত বছরের পুরোনো বৃক্ষের নিচে যাই।

ওগো পাতা কুড়োনো মেয়ে, তোমার পাতার স্তূপে আমাকে শুতে দেবে ?

পর্দা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি।

সমস্ত আঁধারের মধ্যে জ্বলজ্বল করে দুটি চোখ।

৮

আমরা একটা অসহ্য দমবন্ধকর পরিবেশে বাঁচছিলাম। আব্বার অফিস থেকে ভুটান যাওয়ার প্রস্তাব এলে আমি আর মিতুল যাতে সঙ্গে যাই, আমাকে রাজি করাতে আব্বা প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন। ভুটানে গিয়ে বুঝি কী নরকের মধ্যে আমরা ছিলাম। মেঘ, পাহাড়, যেখানেই পা রাখি, চোখ রাখি অপূর্ব সুন্দরের বর্ণচ্ছটায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল মিতুলের ব্যবহার। নিজেকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। ছবির পর ছবি তুলে যাচ্ছিল। নিজের ছবি তোলার জন্য আব্বার কাছে মোবাইল ফোন দিচ্ছিল।

অথচ আমাদের বাড়িতে মিতুলের কোনো ছবি নেই। ওর শৈশবে আমার ইচ্ছে হতো না। বড় হয়ে মিতুল অবশ্য ছবি তুলেছে। এখন যেমন ইয়া বিশাল পিতলের বুদ্ধ'র মূর্তির সামনে সে হাঁ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

প্যাঁচানো পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে আমরা এর চূড়োয় উঠে চারপাশের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে যাই। সবুজ নীল উঁচু নিচু গুচ্ছ পাহাড় ঘেঁষে মেঘের কী অত্যাশ্চর্য খেলা! অ-নে-ক নিচে দেখি বড় গোল এক চত্বরে যেন হাজার হাজার রক্তজবা ফুল থেকে ধোঁয়া ধোঁয়া উঠছে। আমি তাজ্জব হয়ে মিতুলের দুর্লভ মুখ দেখি, সেদিকে হাসিমুখে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে অস্ফুটে বলছিল, বন্ধু ঠিকই বলে, গড একজন বিশাল আর্টিস্ট।

শান্তনুর কথা বলছে।

আরও বেশি ভালো লাগছিল বাবা-মা'র রোমান্টিসিজম। এক একটা জিনিস দেখে দুজনই দুজনকে জড়িয়ে ধরছিল। ছবি তুলছিল পরম একাত্ম হয়ে।

মা বলছিল বাবাকে, তুমি আমার আগে চলে গেলে আমি বাঁচব না, বিশ্বাস করো ?

তুমি সংসারটা সেভাবে গোছাতে পারো না। আমার হেল্প ছাড়া তুমি কিচ্ছু পারো না, এ জায়গায় তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু তোমার উপস্থিতি ছাড়া আমার বাঁচাও অসম্ভব।

আব্বা-আম্মা বাড়িতে আমাদের সামনেই ভালোবাসা প্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃতি যেন তাদের সব বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

তখন দেশে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ খালেদা জিয়া টানা নিজেকে নিজেই ঘরে আবদ্ধ করেছে। পেট্রোল বোমায় মানুষের পর মানুষ মারা যাচ্ছে।

আমরা পারতপক্ষে ঘর থেকে বেরোই না। এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় আব্বার এক পুলিশ বন্ধু সঙ্গে

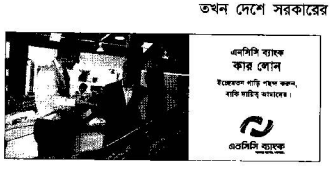

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। বিষণ্ণমুখে এয়ারপোর্টে থেকে ফিরতে গিয়ে বাবা বলেন, একটা ট্যাক্সি নিলেই চলবে। অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে শুনেছি। তা ছাড়া আজ শুক্রবার...।

রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা ফাঁকা। একগ্লাস পানি খেতে যে-ই উবু হয়ে বোতলে হাত দিয়েছি অমনি বজ্রপাত। গোলকের মতো একটা পেট্রোল বোমা এসে বাবাকে আক্রমণ করে কোনাকোনিভাবে পেছনে আম্মার শরীর জ্বালিয়ে দেয়। আমি মিতুলকে আঁকড়ে ধরে গাড়ি থেকে চিৎকার করতে করতে নামতে থাকি। ততক্ষণে চারপাশে লোক জমে গেছে।

আব্বা স্পট ডেট।

আম্মাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হলো।

আর কত ?

একটা মানুষের জীবনে আর কত সহ্য করা যায় ?

চাক্ষুষ এমন একটা অবস্থার মধ্যে থাকায় মিতুলও কয়েকদিন অপ্রকৃতিস্থের মতো আচরণ করছিল। আমাকে এমনভাবে জাপটে থাকত, আমার হাসপাতাল-বাসা করতে খুব ঝামেলা হচ্ছিল।

মিতুল আব্বা-আম্মাকে খুব ভালোবাসত। এর বহু আগেই ক্রসফায়ারে মন্টু মারা গেছে। তার দাদা-দাদির নাতনিকে নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই।

এরপরও একদিন ওর দাদা খালি বাসায় মিতুলকে পেয়ে ওসব আবোলতাবোল কথা বলে ওর মগজ ভারী করে দিয়েছে।

তিন দিন পর আম্মাও মারা গেল।

একটা পরিবারের তিনজন মানুষের ওপরই প্রকৃতি এত ভয়ংকর এক খেলা দেখাল, প্রায়ই মনে হতো, আত্মহত্যা করি। যথারীতি মিতুলের জন্য পারতাম না।

চারপাশে বৃষ্টি ধোয়া কাঁচা নারকেলের আঁশের মতো প্রকৃতি। আমি বান্দরবানের মধ্যে ভুটানের আবহ খুঁজে পাই। মাঝে মাঝে মনে হয় পুরো জায়গাটায় চক্কর খাই। অনেক সময় স্কুলের টিচাররাও একাত্ম হয়ে ঘোরে, কখনো পিকনিকে যায়।

আমি মিতুলকে ফেলে যেতে পারি না।

যে মিতুল ভুটান গিয়ে আত্মহারা হয়েছিল, বান্দরবানে সে নিজের স্কুল আর বাড়ি ছাড়া কোথাও যেতে চায় না। স্কুলে বাচ্চাদের মধ্যে বেশ লাগে। ক্লাস শেষে যথারীতি মুগ্ধ হয়ে চারপাশ দেখছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে ঘাড়ে হাত রাখে কেউ। ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক, সুলতানা ? এখানে ?

হাসব্যান্ডের বদলি হয়েছে।

আমি কষে ওর হাত মুঠো করে ধরে বলি, ফেসবুকে কিছু জানালি না ?

ভাবলাম সারপ্রাইজ দিই। তুই না জানালে কী হবে আমি শান্তনুর কাছ থেকে সব খবর জানি। রাস্তার পাশে কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে সেখানে দুজন বসি।

তোর সঙ্গে শান্তনুর রেগুলার যোগাযোগ আছে আমি জানি, বলি আমি। আসলে মিতুলের একটাই পৃথিবী শান্তনু। মিতুল জানে, আমার সঙ্গে শান্তনুর যোগাযোগ নেই। এ বিষয়টাই শান্তনুর ব্যাপারে মিতুলকে প্রত্যয়ী করে তুলেছে। যেমন তার সুন্দর মাকে বাদ দিয়ে মা'র কাজিন, বন্ধু মিতুলের বন্ধু হয়েছে। এটা মিতুলের অনেক পরম পাওয়া।

বলতে বলতে টের পাই পায়ে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, বাঁ হাতে পিঁপড়ে ঘষে কথার তোড়েই বলে যাই, তাই আগে শান্তনুর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করতাম। মিতুলের সবরকম অবস্থা জানতে পারতাম। এখন ধীরে ধীরে একেবারে কমিয়ে দিয়েছি। মিতুলের সঙ্গে এই বিট্রেটা করা ঠিক হবে না।

শান্তনু তোকে খুব মিস করে, সুলতানা মাথায় ওড়না দেয় রোদ থেকে বাঁচার জন্য।

রাস্তা দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন লোকজন যাচ্ছে।

আমি হেসে বলি, শান্তনু মিস করে আমি জানি। একসঙ্গে দুজন বড় হয়েছি। এক স্কুল-কলেজে পড়েছি। ছোটবেলায় আত্মীয়রা আমাদের বর-বধূ বানাত। বাদ দে, তুই আমার স্কুলে ? কীভাবে ?

বদলির কারণে এক মাস রুদ্ধশ্বাস জীবন গেছে। এসেও একটা কাজ খোঁজার ধান্দা, সত্যি বলতে আমিই ফেসবুকে বসার সময় পাই নি। তোদের স্কুলে আর্ট টিচার হিসেবে আপাতত জয়েন করেছি আজ। এক মাসের মধ্যে আরও স্কোপ খোলা আছে, দেখা যাক।

কিছুক্ষণ ভেজা রোদ্দুর মেশানো নীরবতা। মাথার ওপর দিয়ে ডানা বিস্তার করে পাখি উড়তে থাকে।

মিতুলের ব্যাপারে তুই তো এখন আর জানিস না...বলতেই কথা লুফে নেয় সুলতানা, কী বলিস জানি না ? শান্তনু আমাকে এমন কোনোদিন নেই ওর ব্যাপারে বলে নি। শান্তনুর ভয় কাজ করে কখন মিতুল আত্মহত্যা করে বসে। আর মিতুলের কিছু হলে যেহেতু আগে বাবা-মা হারিয়েছিস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব হারিয়ে তুই কী করে বসবি, এসব নিয়ে অনেক ভয় ওর। তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে না হলেও সে মিতুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

আঙুল দিয়ে নখ খোঁটে সুলতানা। তুই কি জানিস না মিতুল কত ভালো পেইন্টিং করে ? তুই ওকে বোঝাতে পারিস না, রূপ না, মানুষের গুণটাই আসল ?

ওর পেইন্টিং ও আমাকে দেখায় ? বিমর্ষ কণ্ঠে বলি। কালেভদ্রে কী ঘরে ওর রুমে গেলে দেখি রঙতুলি... কিন্তু ও বেশিক্ষণ তার ঘরে আমাকে এলাও করে না। ভালো পেইন্টিং করে ? বাহ! তোর মুখে শুনে খুব ভালো লাগল। আর রূপ না গুণ এটা শেখাব মিতুলকে ? একথা শোনার ধৈর্য আর বিশ্বাস কিছু ওর আছে ? বোঝার পর থেকে সোসাইটি তার রূপ নিয়ে ওকে যে ঘা দিয়েছে, সর্বনাশ হয়েছে আমি ওর চেয়ে দেখতে ভালো বলে।

ওর চেয়ে দেখতে ? হাঃ হাঃ তোর রূপের তুলনা হয় ?

এই তো, তুইও কিন্তু বলছিস।

সরি সরি। তা তুই মাথায় মুখে তেল মেখে এমন সন্ন্যাসী হয়ে আছিস কেন ? ভাবছিস এতে রূপ ঢাকা যাবে ?

শূন্যতার বিবশতায় হেলান দেয় আমার সত্তা। বুকটা প্রায়ই হু হু করে, এখনো করছে।

প্রায় লাফ দেয় সুলতানা, মিতুল স্কুল ড্রয়িংয়ে ফার্স্ট হয়েছে, আমি আজ দেখে এলাম।

বলছিস কী ? কবে রেজাল্ট দেবে ?

আগামীকাল।

আমার উত্তেজনা ক্রমশ নেতিয়ে আসে। এতেও মিতুলের কিছু যাবে আসবে না।

তুই হাল ছাড়লে এই জঙ্গলে এসে মেয়েটাকে নিয়ে পড়ে আছিস কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোকে তো কেউ বদলি দেয় নি, একটু দম নিয়ে সুলতানা বলে, দেখবি একদিন এই ড্রয়িংই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। আজ বললাম, একদিন মিলিয়ে নিস।

সুলতানার হাতের বোতল থেকে পানি খাই। ওর কথায় প্রত্যয়ী হতে ইচ্ছে করে।

বুঝছিস না কেন মিলি, ওর টিনেজ চলছে। এই বয়সে অনেক যোগ্য সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গেও মা'দের খিটমিট লাগে। মূলত এই বয়সেই এরা ড্রাগে জড়ায়। মিতুল যে নিজের কোনো ক্ষতি করে নি, ড্রাগে জড়ায় নি, এ কি কম ? ওর রেজাল্টও তো ভালো। এইট্রি পার্সেন্ট। আমাকে বলেছে শান্তনু, কোনো টিচার ছাড়া, কোচিং ছাড়া এই রেজাল্ট ও করেছে। আজ পয়লা দিন আমি মিতুলের খোঁজটাই ভালো করে করেছি।

আমার অন্তরে মন্তরের শিখা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে মিতুলের ?

হয়েছে। এক কর্নারে বসেছিল। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নেয় সুলতানা, ক্লাসেও সে কর্নারেই নিজের মতো বসে থাকে। আমি টিচারদের সঙ্গে আলাপ করেছি, তারা বলেছেন, ক্লাসের প্রথম দিন ওকে সবাই বানর শিম্পাঞ্জি বলে ক্ষেপিয়েছিল। এরপর থেকে কারও সঙ্গে মেশে না। কেউ মিশতে চাইলেও বাজে ব্যবহার করে। টিচাররা তাকে অনেক বুঝিয়েছে। তার মুখ দিয়ে একটি রা-ও বেরোয় নি।

আমার আত্মাভূমি পদপিষ্ট হয়, অস্ফুট কণ্ঠে বলি, এটা শান্তনু আমাকে বলেছে, সেদিন নাকি বাথরুমে বসে অনেক কেঁদেছে ও।

তুই এটাকে পজেটিভলি দেখবি না ? সুলতানা উত্তেজিত। সে যে এজন্য স্কুল যাওয়া বন্ধ করে নি। নিয়মিত ক্লাস করে যাচ্ছে।

আমি মাথা নাড়ি, ঠিক। কিন্তু দেখ সুলতানা আমরা দুজন মা-মেয়ে দু ঘরে থাকি প্রায় অপরিচিতর মতো। খাবার তৈরি হলে নক করে ট্রে এগিয়ে দিই ওর দিকে।

খায় ?

হ্যাঁ, তা খায়। মাঝেমধ্যে ওর পছন্দের ডিশ করলে চেটেপুটে খায়। ছোটবেলায় যা পছন্দ করত আমি তো জানি।

তো ? চোখ বড় বড় করে তাকায় সুলতানা, এতটা বছর সহ্য করেছিস ওকে আরেকটু বড় হতে দে।

রোদ পড়েছে। ছায়া মাটির বুনো ঘ্রাণে মনটা এক অদ্ভুত প্রত্যাশায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ফের তলিয়ে যাই, ওর অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে আমার রূপ ওর জন্মের শত্রু। এ থেকে মিতুল বেরুতে পারবে কি না সন্দেহ। তো মিতুলের সঙ্গে কথা বলেছিস ?

আশ্চর্য ব্রেন! কোন শৈশবে আমাকে দেখেছিল। ঠিক চিনেছে। আমি কাছে যেতেই বলল, মিসেস মিলি আপনাকে পাঠিয়েছে ? আমি একটু থ মেরে যাই তোকে মা পর্যন্ত ডাকে না ? ফের নিজেকে সামলে নিই, এখানে মিসেস মিলি কই থাকে আমি জানি না। আমি দিনাজপুর থেকে বদলি হয়ে এখানে এসেছি। আমি তোমাদের ড্রয়িং টিচার।

ও চুপ করে থেকে বলল, আমি আপনার কাছ থেকে ড্রয়িং শিখে কিছু হতে চাই না। আমার নিজের যা মনে হবে শিখব।

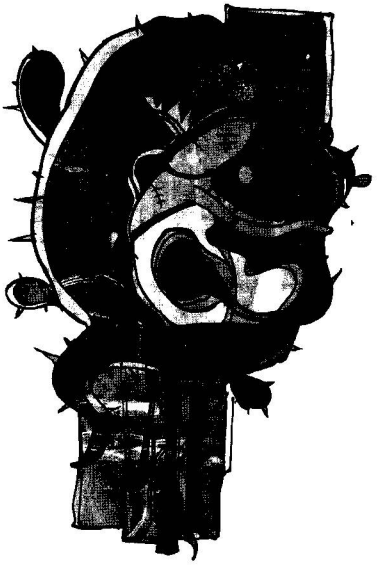

স্কুল রুটিন ফলো করবে না ?

আর্ট আমি কোনোদিন কারও কাছে শিখি নি।

তোমার আগের টিচারের কাছে শিখতে না ?

না।

আমি সুলতানাকে তক্ষণি থামিয়ে দিই। এটা ও সত্য বলেছে। কেউ কিছু এঁকে দেখালে তা সে আঁকতে পারে না। তুই তো জানিসই আমি নীলুর সঙ্গে থাকি। এই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস নীলুর খালা। আর্ট নিয়ে টিচারের সঙ্গে এমন ঝামেলার সময় আমরা উনার কাছে যাই। মিতুলের সব বিষয় খুলে বলি। অ্যাডমিশন পরীক্ষায় মিতুল ফার্স্ট হয়েছিল। পেইন্টিংয়ের ব্যাপারটা তাই টিচার কনসিডার করে দেন। সে কখনো মন থেকে, কখনো স্কুলের আশপাশের প্রকৃতি দেখে ছবি আঁকত। কিন্তু এত ভালো আঁকে ও গড মা হয়ে আমি জানি না, ও আমি তো আবার ওর মা না, মিসেস মিলি সুলতানা। কিন্তু আশ্চর্য আমাকে ঘরে ও মা বলেই ডাকে। মানুষের সামনেই এমন বলে, কেন যে বলে!

আমার কণ্ঠ জলাদ্র হয়ে উঠছে দেখে তড়িঘড়ি প্রশ্ন করে সুলতানা, ও ভর্তিতে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে এই রেজাল্ট করছে কেন ?

জানি না। আমার দীর্ঘশ্বাস প্রলম্বিত হয়। ও আমার কাছে এক বিস্ময়।

টিচারদের সঙ্গে ওর ব্যবহার কেমন ?

এই তো চুপ থাকে। জরুরি প্রশ্নের উত্তর দেয়। কেউ কোনোদিন ওকে হাসতে দেখে নি। হেডমিস্ট্রেস

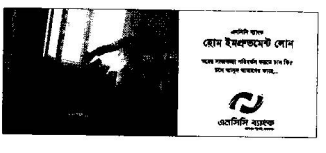

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুলের ব্যাপারটা নিজের মতো করে অন্য টিচারদের বলে ওর ব্যাপারে কনসিডার করতে বলেছিলেন।

এবার আমাদের পা বেয়ে বেয়ে পাছা অব্দি পিঁপড়া কামড়াতে থাকে।

চল আজ যাই। বলি আমি। ঠিকানা দিচ্ছি আমি, তুই চলে এলে নীলুসহ জম্পেশ আড্ডা দেওয়া যাবে।

যেন অনন্তকাল আড্ডা কী জিনিস ভুলে গেছি।

৯

কী এক বোধে বিছানায় তলিয়ে নিজেকে মিতুলের জায়গায় রেখে কবিতার মতো কিছু একটা বানাতে থাকি।

দুহাত উড়িয়ে দিই বাজপাখি ডানার মতো, কী যে এক দমবন্ধকর আন্ধারে তলিয়ে ছিলাম, জন্মের পর বড় হতে হতে মানুষ নয়, কখনো শিম্পাঞ্জি, কখনো পেঁচার মতো হতে থাকলাম।

যখন একা থাকি, আচমকা নিমগ্নতার মধ্যে পড়ে যাই। দেখি রূপবতী উড়ালপরী আমি গায়ে মেঘপুঞ্জের ওড়না জড়াচ্ছি।

রঙধনু এসে আমাকে প্যাঁচাতে থাকছে।

আচমকা বজ্রপাত।

স্বপ্নভঙ্গে ছিটকে দর্পণের সামনে।

ফের আগের শিম্পাঞ্জি চেহারা।

জট লেগে সত্তায় ঘোর টাটানি। বিবমিষা বোধ থেকে আয়নায় পাথর ছুড়ে মারি।

বুমেরাং

আমার মা'র রোদেলা রূপ এসে আমার পথের উল্টো দিকে আমার দিকে ছুড়ে দেয়।

হায় আমার মাথা থেকে টস টস রক্ত ঝরছে।

কান্নায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। আমাদের ঘরে সেই অর্থে আয়না নেই বললেই চলে। বড় আয়নাটা ইট ছুড়ে ভেঙে ফেলেছিল মিতুল, বলেছিল, অত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজের রূপ দেখতে হবে না।

মিতুলের ঘরে কোনো আয়না নেই। চুল আঁচড়ানো, ঠোঁটে ক্রিম এসব টুকটাক কারণে আমার ঘরে একটা ছোট আয়না দেয়ালের সঙ্গে লটকে রেখেছি।

মাঝে মাঝে ভাবি, এ কী জীবনের মধ্যে আমি বাস করছি ? আমার জীবনটাকে ফালাফালা করে দিল মন্টু। ক্রসফায়ারে ওর মৃত্যুতে আমার শান্তি হয় নি। আমার মনে হতো ওকে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায়ই চাপাতি দিয়ে ওর প্রত্যেকটা অঙ্গ যদি আলাদা করতে পারতাম! প্রায়ই আত্মহত্যার কথা ভাবলে প্রাণ যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। এই মলমূত্রময় জীবন থেকে মুক্তি পায়!

মিতুলের কী হবে ?

কে মিতুল ? আমাকে এক কণা ভালোবাসে ? আমার সঙ্গে জীবনযাপন করে ? ওকে এক পশলা জড়িয়ে ধরার কথা কল্পনা করতে পারি ?

নিজ জীবনের হতাশা নিয়ে দিব্যি পড়াশোনা, পেইন্টিং করে যাচ্ছে। আমি চলে গেলে সবাইকে চমকে দিয়ে আরও বড় কিছু করবে।

ক্রমশ আমার মন নিজ হন্তারক হিসেবে নিজেকে খুশি খুশি রিসিভ করতে চাইলে আমার মন বলে, তার মানে ওর প্রতি তোমার মায়া থাকার কারণ নেই, না ?

না, নেইতো।

তবে যে ও ক্লাস থেকে একটু দেরিতে ফিরলে তুমি ছটফট করতে থাকো ? চারপাশে নির্জন পাহাড় অরণ্য। আমার বুক আকুল মায়ায় ভিজিয়ে আমার কপালে মিতুলের জলপট্টির দৃশ্যটা এগিয়ে আসে।

হাসি হাসি মুখে ঘুমিয়ে পড়ি।

শান্তনুকে কীভাবে আসতে বারণ করি ?

এখানে এসে সে মিতুলের সামনে কতক্ষণ আমাকে উপেক্ষার নাটক করতে পারবে ?

শৈশব থেকে বিশেষ করে সম্পর্ক বলে ওর প্রতি আমার এক প্রগাঢ় মায়া আছে। শৈশবে যে-কোনো বন্ধে আমাদের বাসায় কাটিয়ে যেত ও। ওর সঙ্গে ছুটতাম, মার্বেল খেলতাম, ঝগড়া করতাম।

ও যখন কিশোর, ওর মা মারা যায়। ওর বাবা লজ্জার মাথা খেয়ে দুমাসের মাথায় কৈশোর পেরোয় নি এমন এক মেয়েকে বিয়ে করে আনে।

ভাইবোনসহ বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে ওর ভাইবোনগুলো। অন্যদের অবশ্য খুব একটা বিপাক হয় নি, কেউ চাকরি করে কেউ ভার্সিটিতে পড়ছে।

সবার ছোট শান্তনু সবে এসএসসি দেবে। মা'র সঙ্গে কীভাবে মিশবে এর কোনো কিনারা না পেয়ে ওই নারী থেকে সে প্রায় পালিয়ে চলত।

হলে হবে কী। মহিলা শান্তনুকে অক্টোপাশের মতো জড়াতে চাইল নিজের কাছে। কখনো কষে বুকে চেপে ঠোঁটে চুমু খায়। নানা জায়গায় চাপ দেয়।

একদিন সীমানা ডিঙিয়ে ওর প্যান্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বলে, দেখি তো তুই কত বড় হয়েছিস ?

পরীক্ষা গোল্লায় ফেলে সে ট্রেনে চেপে বসে। মা ওকে ভীষণ আদর করত। মাকে জড়িয়ে নিজের মা'র জন্য অঝোরে কাঁদছিল সে।

মা ধীরে সুস্থে ওকে থামিয়ে ওর লজ্জা ভাঙিয়ে বলে, তুই ওখানে হোটেলে থেকে পরীক্ষা দিয়ে পুরোপুরি এখানে চলে আয়।

আমরা ভাইবোন না, বন্ধুর মতো বড় হচ্ছিলাম। ছোটবেলা থেকেই ওকে আমার কখনো ভাই মনে হয় নি। বড় হয়ে আমরা গল্প করতাম, বন্ধুত্ব কত সুন্দর একটা সম্পর্কের নাম, কিন্তু আমরা প্রেমের সম্পর্ককেও স্রেফ বন্ধু নাম আখ্যায়িত করে এই শব্দের অর্থ নষ্ট করে দেই। আমার একথায় কেমন যেন ঝিম মেরে যেত সে। তবে কি সে-ও অন্য ছেলেদের মতো আমার প্রেমে—?

না, না, আজ পর্যন্ত সে কোনোদিন আমাকে তেমন কোনো ইঙ্গিত দেয় নি। চাকরি নিয়ে ঢাকায় দিব্যি দিন কাটাচ্ছে। বিয়ের প্রসঙ্গ এলে বলে, আমি প্রেম ছাড়া বিয়ে করব না। এখনো তেমন কারও প্রেমে পড়ি নি, বিয়েও হচ্ছে না।

সারা ঘরে ঝুপসি আঁধার।

এক সময় আজানের শব্দ শোনা যায়। কী বুঝে উঠে বসি। আমাদের বাড়িতে তেমন নামাজের অভ্যাস ছিল না। কিন্তু আম্মা প্রায়ই ভোরের সময় নামাজ পড়তেন।

জায়নামাজ বিছিয়ে আমিও পশ্চিমমুখী হই। আমার সব প্রার্থনা মিতুলকে নিয়ে হয়।

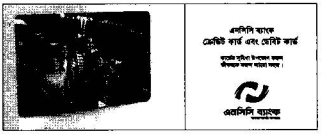

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফের বিছানায় যাই।

প্রভাত নামছে।

চারপাশে আলোছায়ার সঙ্গম। চারপাশে ভয়ানক নীরবতা।

রাতের গর্ভাশয় থেকে দিনের জন্ম হচ্ছে।

কবিতাটাকে তুমি সিরিয়াসলি নিলে পারতে, জিতু বলত, তোমার কথার ভাঁজে ভাঁজে আমি কবিতা পাই।

ধুর ছাই। কবিতা লেখা এত সহজ? আমাদের এখানে ডায়রিতে যা ইচ্ছে তাই লিখে ছেলেমেয়েরা তা নিয়ে কবিতার বই করে ফেলে।

একমাত্র জিতু আমাকে স্পর্শ করেছিল। কী নান্দনিক! কী অপূর্ব! শহরের বাইরের একটা নির্জন নদীতে ছইঅলা নৌকার চারপাশ কাপড় দিয়ে ঢেকে মাঝিকে কাপড়ের আড়ালে রেখে আমাকে শুইয়ে দিয়েছিল গলুইয়ের কাছে। ওপরে আসমান, চারপাশে কাশবন। আমরা দুজনই ঠিক করেছিলাম, বিয়ের আগে একজন আরেকজনের ভেতরে প্রবেশ করব না।

ব্লাউজ খুলে জিতু যখন উন্মত্ত, আমি তখন স্বর্গের ধাপ পেরোচ্ছি। লাগাম ছুটে গেল আমারই, আমি শাড়ি ওপর দিকে টানতে টানতে তাকে ভেতরের দিকে টানছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য জিতু মুহূর্তে নিজেকে সামলে দ্রুত আমার কাপড়চোপড় ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জিতু ও জিতু, তুমি এখন কোথায়?

শব্দহীন ছায়া থেকে কোনো উত্তর আসে না।

আমার ওই ঘটনার পর জিতু এসেছিল। আমি তখন উন্মাদপ্রায়, স্যান্ডেল ছুড়ে মেরেছিলাম ওর দিকে।

কেন এসেছ, আমাকে কামড়াবে?

সেইদিনের পর থেকে জিতু হাওয়া। পরে শুনেছি দেশের বাইরে চলে গেছে।

জীবনে এ নিয়ে যে অনুতাপে আমি পুড়েছি, আর কিছু নিয়ে নয়। এরপর মিতুলের কারণেই আমি আর ওর খোঁজ করি নি।

আমার কি শরীর-মনের সব চাহিদা মরে গেছে? তবে যে নৌকার স্মৃতি স্মরণ করে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! জিতুকে যতবার মনে পড়ে হু হু বুক ক্ষরণে আমি একেবারে ভেঙে পড়ি। মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়, জিতু যদি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি এই জাগতিকতা, মিতুল সব ছেড়ে ওর কাছে চলে যাব।

আসলেই কি তা পারব?

চোখ ভিজে আসে, না।

আমার দেহে কামড়ের দাগের এখনো চিহ্ন আছে। যদিও আম্মা আমাকে শকুনের মতো ছো মেরে লেজার সেন্টারে নিয়ে গিয়ে আমাকে অনেকটা ঠিক করিয়ে এনেছেন।

শুক্রবারে কাঁচাবাজারে গিয়ে নীলুর সঙ্গে দেখা। ততক্ষণে মাছ, সবজি নিয়ে আমি রিকশায় উঠব উঠব। নীলুর বাজারও শেষ। আমি বলি, পাশাপাশি ঘরে থেকে বাজারে এসে দেখা হলো?

মাই গড! আজ সন্ধ্যায়ই তোমার ওখানে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, হাসে নীলু, ব্যাংকের কাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত ছিলাম রে। আর হাতে সময় না নিয়ে তোমার ঘরে যেতে ইচ্ছে করে না।

জানো, সুলতানা এসেছে?

জানি জানি। রিকশায় উঠতে উঠতে নীলু বলে। ও হাত বাড়ালে আমিও উঠি।

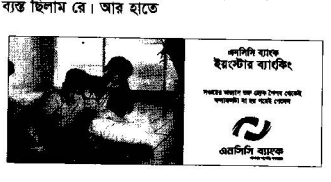

চল আজ সন্ধ্যায় সুলতানাকেও ডাকি। তিনজন মিলে জম্পেশ আড্ডা দেব।

আমি চুপ থাকি।

দয়া করে মিতুলের দোহাই দিয়ো না। ও দিব্যি নিজের মতো চলে। তুমি একটু তোমার মতো চলতে পারবে না?

কথাটা মনে ধরে, কী জানি সুলতানা পারে কি না।

চারপাশে উঁচু নিচু রাস্তা আর পাহাড়ের বুনো ঘ্রাণে আমি হঠাৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

আসবে না মানে? চুল ঝাঁকায় নীলু। আমি আঁকশি দিয়ে টেনে আনব।

ঠিক আছে।

আমি, নীলু, শান্তনু সুলতানা একই ব্যাচের ছিলাম।

জাহাঙ্গীরনগরকে আমরা বলতাম আমাদের শান্তিনিকেতন। নীলু ও আমি একরুমেই থাকতাম। সে কাউকে সহসা তুই করে বলতে পারে না। শুরু হওয়া সম্পর্কের আরম্ভ থেকে সেই যে তুমি করে ডাকত, তা আর বদলায় নি। আমাদের জীবনের চারজনের মধ্যে সেই অর্থে সুলতানাই সেটেলড হয়েছে।

নীলুর জীবনটায় বড় আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটেছে। আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ওরই প্রেম ছিল। একেবারে ওয়ান থেকে একসঙ্গে পড়ে। তারা বাল্যকালেই একজন আরেকজনকে প্রেম নিবেদন করেছিল। ফলে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের ছিল প্রগাঢ় মায়া।

জহিরের সঙ্গে কী কথা, কী ঘটনা সব পুঙ্খানুপুঙ্খ আমাকে না বলে শান্তি হতো না।

অনার্সের পর থেকে নীলুর বাড়িতে জোর বিয়ের চাপ এল। ওর ছোটবোনটা কার সঙ্গে যেন প্রেম করে বিয়ে করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওদের পরিবার বড়র আগে ছোটর বিয়ে দেবে না এই সিদ্ধান্তে অনড়।

১০

তুমি তো আমার বাড়ির সব জানো, তোমার কাছে তো গোপন কিছু নয়। ক্যাম্পাসের রাস্তা ধরে নীলু আর জহির হাঁটতে হাঁটতে একটি নির্জন জায়গা খুঁজছিল।

জহির চুলে আঙুল চালায়, তা কি আর আমি জানি না? এ জন্যই তো আমি এমএ কমপ্লিট না করে হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছিলাম। এনজিওতে একটা চাকরি পেয়েও গেছি। কুমিল্লায়। ওখানে জয়েন করেই আমি প্রস্তাব নিয়ে যাব।

তুমি এমএ করবে না?

ভার্সিটি থেকে ট্রান্সফারের চেষ্টা করব, বলতে বলতে জহির তার সহজাত দুষ্ট স্বভাব থেকে আচমকা দাঁড়িয়ে বলে, চলো আমরা এই দেবদারু গাছটার নিচে বসি।

নীলু অবাক, দেবদারু? এটা? তুমি কি ইউক্যালিপ্টাস গাছও চেন না?

হাসে জহির, তোমার মাথা গেছে। আমি কী পরিমাণ গাছ চিনি তোমার চেয়ে আর কে বেশি জানে?

এই তোমার গাছ চেনার নমুনা? উত্তেজিত হয়ে ওঠে নীলু, ইউক্যালিপ্টাসকে দেবদারু বলছ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ নিয়ে তর্ক তুঙ্গে উঠলে এক স্টুডেন্টকে মরিয়া হয়ে ডাকে নীলু। আচ্ছা বলো তো এটা কী গাছ ?

কেন ইউক্যালিপ্টাস।

যখন জেতার আনন্দে নীলু মারমুখী তখন হাঃ হাঃ করে হাসতে থাকে জহির। তুমি সেই ছোট্টটাই রয়ে গেছ। তোমাকে ক্ষেপানো এত সোজা।

ওর এই ব্যাপারগুলিই নীলুকে খুব টানত।

মাথার ওপর দিয়ে সারসার পাখিগুলো উড়ে যাচ্ছে।

জহির উশখুশ করে, আসলে মানুষ যা নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখে, ছক তৈরি করে তা কিছুতেই হয় না।

তুমি কী বিষয়ে বলতে চাইছ ?

না, এই মুহূর্তে তোমার মুড অফ করতে চাই না।

মুড অফ হওয়ার মতো কথা ? নীলু তীক্ষ্ণভাবে জহিরের মুখোমুখি হয়, তাহলে তো শুনতেই হবে বলো।

কী আর বলব নতুন ? তুমি জানোই এম এ পাস করে দুজন চাকরি নিয়ে খুব ফর্মালভাবে বিয়ের ইচ্ছে ছিল আমার। শৈশব থেকে পরিচিত, এমনিতেই আমরা দুজন দুজনের কাছে অনেকটাই রহস্যহীন...

নীলু জহিরের হাতটা চেপে ধরেছিল, ধীরে ধীরে তা আলগা হয়ে আসে, তুমি মিলি আর জিতুর প্রেমকে খুব ঈর্ষা করো, না ?

আরে, এর মধ্যে ওদেরকে ঈর্ষার কী হলো ?

দু হাঁটুর ভাঁজে মুখ ঢাকে নীলু, জহির টান দিয়ে উঠিয়ে ওর ভেজা চোখ মুছে। আমি কি জানি না এই ব্যাপারে আমার চেয়ে তোমার স্বপ্ন কত প্রগাঢ় ? আমি অনার্স করে চাকরির দৌড় বাদ দিয়ে কাবিন করে রাখতে চাইছিলাম। তোমার সে কী প্রতিবাদ! বিয়ের আগে বিয়েকে ডালভাত করা যাবে না।

তাহলে এখন আফসোস করছ কেন ?

হাঃ হাঃ হাসে জহির, দেখলাম ক্ষেপো কি না। সারা জীবনে কদ্দুর চিনেছ আমাকে ? বুদ্ধ, আমার সঙ্গে তুমি কোনো জীবনই কাটাও নি। এত অল্পে কাঁদানো যায়। গড!

না না এ আমার দোষ নয়, তুমি দুর্দান্ত নাটক জানো। এত নিখুঁত করে বলো, মাই গড! অভিনয় করলে শাইন করতে।

কাঁচাবাজার থেকে ফিরে সব গুছিয়ে বিছানায় হেলান দিয়েই আমি নীলুর জীবনে চক্কর খেতে থাকি। সব বন্ধুর মধ্যে নীলুই আমার সবচেয়ে বেশি আত্মার আত্মীয়।

মা আর মেয়ের একটি রুম হলেই চলার কথা। কিন্তু নীলু প্রাণ দিয়ে আমাদের ব্যাপারটা বুঝে দুটি রুম মাগনাই ছেড়ে দিয়েছিল।

আমার জোরাজুরিতে টোকেন মানি নেয়।

পাশের ঘরে সশব্দে কিছু পড়ে ভাঙার শব্দ হয়।

আমি ছিলাটান দিয়ে দাঁড়াই। এরপর দরজা নকের তোয়াক্কা না করে মিতুলের ঘরে গিয়ে দেখি মেঝেতে কিছু কুড়াতে বসেছে।

কী ভেঙেছে ?

গ্লাস।

এত রাত অব্দি জেগে থাকো কেন ?

তুমিও তো জেগে আছ।

তুমি রোজ জাগো, আমি তোমার মতো রোজ জাগি না।

সরো হাত কেটে যাবে, আমি দেখছি।

তোমারও তো হাত কাটতে পারে।

আমি কোন মিতুলের ঘরে এসেছি ? আমার সঙ্গে এত প্রগাঢ় মায়ার তর্ক কি মিতুলই করছে ?

বিস্ময়ে বুকের ভেতরটা খুশি হতে ভুলে যায়।

ওকে আলগোছে সরিয়ে আমি সন্তর্পণে কাচগুলো তুলে ডাস্টবিনে ফেলে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে অনন্তকাল পর ওর চুল ঝাঁকিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে আসি। ভেতরে হু হু আনন্দের বিলোড়ন, মিতুল আমার প্রতি পজেটিভলি বদলাচ্ছে। থ্যাংক গড!

বুকের কাছে বালিশ নিয়ে পাহাড়ি মাটির আঘ্রাণে ভাসতে ভাসতেই ফের নীলুর প্রেতাত্মা এল, তারপর কী হলো, আর বললে না যে ?

যেন ফাতনায় টান পড়ে। নীলু-জহিরকে বড়শিতে ফের গেঁথে যাই।

পৌঁছে ফোন দিয়ো, তক্কে তক্কে জহিরকে বলে নীলু।

দেব, আর কতবার বলবে ? মোবাইলের যুগে একটা ফোন কোনো ব্যাপার ?

আমি বাপু এনালগ যুগেই বাস করি, জানোই তো, আমার কী জানা বাকি তোমার ?

জহির চলে গেলে নীলুর দিনরাতগুলো ধূসর, শূন্যতায় ভরে গেল।

পুরো জীবনে ওদের দেখা হয় নি এমন কম দিনই গেছে। দুজনের বাড়িই ঢাকায়, ফলে ঈদের বা অন্য কোনো ছুটিতে দুজনের কাউকেই বাইরে যেতে হয় নি। রাত এলে নীলুর বুকে প্রস্তরখণ্ড চেপে বসে।

জহির পৌঁছে ফোন দিয়ে বলেছে, একটু গুছিয়ে ওঠার সময়টা দাও, রাতে গুড নাইট কল দেব।

গুড নাইট কলে জহিরের কণ্ঠও বিষণ্ণতায় ঠাসা ছিল।

তার মানে দিন সপ্তাহ মাস ওকে দেখব না ? নীলুর মাথা ভোঁ ভোঁ করে। ও যে জহিরের ওপর হেলান দিয়েই জীবনের এই অব্দি এসেছে। একা কোনো কাজ পারে না নীলু। মিনারেল বোতলের মুখ খুলে দেওয়া থেকে শুরু করে ব্যান্ড দিয়ে চুল বেঁধে দেওয়া পর্যন্ত জহির করত। ভার্সিটির সব নোট থেকে শুরু করে কলম-পেন্সিল সব জহিরের নখদর্পণে। বলত নীলু, আমার মতো এমন অযোগ্যকে ভালোবাসা ছোটবেলার মায়ার কারণেই না ? আমি তো একটা ভেরেন্ডা।

সুন্দর একটা মন আছে তোমার, নীলুর হাতে চুমু খেয়ে জহির বলত। বন্যার্তদের সাহায্য করতে যেভাবে বাড়ি বাড়ি দৌড়াও। কেউ একটা ফড়িঙের ডানা ভাঙলে তার চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করো। একবার মনে আছে, ইয়া বড় কাদাপানির গর্তে একটা কুকুরের বাচ্চা পড়ে গেল। তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে যেন স্লিপারে বসেছ এইভাবে সাই সাই করে সেই বিশাল গর্তের মধ্যে পড়ে...।

হাসতে থাকে নীলু, আর বোলো না, তারপর কত কাণ্ড! আমাদের উদ্ধার করতে দমকল টিভিতে লাইভ দেখাল না ? হাঃ হাঃ।

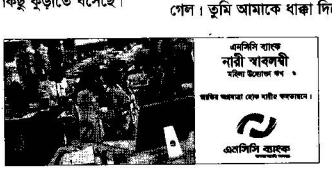

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও কারণ আছে।

উদগ্রীব হয়ে তাকায় নীলু, কী ?

ভীষণ মিষ্টি দেখতে তুমি, বিশেষ করে চোখ।

কী এখনো এসব তোমার কাছে এমন লাগে ? স্কুল-কলেজে খুব বলতে, এইবার অনেকদিন পর বললে।

যাক, হয়েছে।

এইভাবে নীলুর পঙ্গু দিনরাত্রি যায়।

ওদিকে জহির কুমিল্লা গিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, নীলুর সঙ্গে বেশি যোগাযোগের সময় পায় না। এ নিয়ে নীলু ফোনে ভেঙে পড়লে নীলুকে তাচ্ছব করে দিয়ে জহির বলে, এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। ঢাকায় প্রতি মুহূর্তে মনে হতো একটা সাপ আমাকে প্যাঁচিয়ে ধরে আছে।

তুমি এইসব কী বলছ ? প্রায় আর্তনাদ করে নীলু, এখানে থাকতে আমার সঙ্গে কত খুশি ছিলে, তবে কি ওগুলোও অভিনয় ছিল ?

হাঃ হাঃ হাঃ, দিলাম তো নার্ভাস করে ?

নীলুর বুক থেকে পাথর সরে যায়, প্লিজ দয়া করে আমার সঙ্গে এমন ফাজলামো করবে না। এসবে কত যে যন্ত্রণা তুমি কী বুঝবে ?

কিন্তু যত দিন যায়, এমন অবস্থা পৌঁছায়া সারা দিনে একটা ফোন দেওয়ার সময় পায় না জহির।

নীলু বাসে চেপে বসে।

কুমিল্লা নেমে রিকশা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ঠিকানায় পৌঁছে দেখে জহির কয়েকজনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে।

নীলুকে দেখে হতবাক হয়ে এগিয়ে আসে জহির। বিস্ময় কাটিয়ে রাগে ফেটে পড়ে সে, একটা ব্যাচেলার ছেলের বাসায় আসার আগে তোমার দশবার ভাবা উচিত ছিল। লোকগুলো কী ভাবল!

তুমি তো যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছ, অসহায় কণ্ঠে নীলু বলে, আমার কোনো ব্যবহারে আপসেট হয়েছ ? তুমি কি ভুলে গেছ এমএ না পড়ে কুমিল্লায় কেন এসেছ ?

সব মনে আছে, দাঁতে দাঁত চেপে বলে জহির, তোমার জীবনেও ম্যাচিওরিটি হবে না। এটা জাদু নাকি চাইলাম আর হয়ে গেল ? এক জায়গায় ঠিকমতো স্যাটেলড হওয়া কত কঠিন তুমি কী বুঝবে, যা হোক, এখন চলো।

কোথায় ?

বাসস্ট্যান্ডে। যাতে আগে আগে ঢাকায় পৌঁছাতে পারো।

নীলুর আত্মার মাংসকুণ্ডলী বেদনায় জ্বলে যাচ্ছিল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দুজন রিকশায় উঠে।

জহির কোনো কথা বলে না।

নীলু শেষবারের মতো মরিয়া হয়, বলে, শুধু একটা উত্তর দাও, আমি কোনো দোষ করেছি ?

না। দোষ আমারই, ভেবেচিন্তে নিজের গন্তব্য ঠিক করতে পারি না। সরি নীলু, বলে তাকে ধন্য করে দিয়ে তার হাত টেনে চুমু খায়। কটা দিন ধৈর্য ধরো, আমি একটু সামলে নিই।

তুমি বিয়ের প্রস্তুতিও নিচ্ছ এর মধ্যে ? টিপটিপ বুক নিয়ে প্রশ্ন করে নীলু।

ফের মেজাজ বিগড়ে যায় জহিরের, চাকরিটাই ভালোভাবে গুছিয়ে উঠতে পারছি না। এখানকার ভার্সিটিতেও ছুটছি, টিসি এনে ভর্তি হতে হবে না ?

বাসে উঠে জানালার পাশে বসে উপচানো কান্নায় ভেসে যেতে থাকে নীলু। নিজেকে কী কষ্টে যে সামলায়! ওড়না ভিজে জবজবে হয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে এসে আমাকে ফোন দেয়। কুমিল্লা যাওয়ার আগে যেতে যেতেও আমাকে বার কয়েক ফোন করেছে। কিন্তু ওর এখনকার কণ্ঠ আমার প্রাণটা হিম করে দেয়। হ্যালো, বলেই হেচকি দিয়ে কাঁদে নীলু, মিলি, জহির বদলে গেছে।

এরপর যা ঘটেছে তার স্বভাব অনুযায়ী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলে আমাকে।

আমিও ধমকের সুরে বলি, কী পেয়েছে ও, শৈশবের বালিকা প্রেমিকা ? তোমরা একইসঙ্গে ছোট ছিলে, একইসঙ্গে বড় হয়েছ। সে তোমার সঙ্গে এই টোনে কথা বলতে পারে না। তুমিও পাল্টা কড়া কিছু না শুনিয়ে এসে কেঁদে চলেছ, এই জন্যই ও পেয়ে বসেছে। আমার ইচ্ছে করছে কড়া করে ওর মুখোমুখি বসি। কিন্তু জহির তো আমার সঙ্গে কী জানি কেন ঠিকমতো কথাই বলতে চায় না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। অন্য ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট বলে ওর সঙ্গে আমার দেখাও হয় কম। আমি এখানে কতদূর কী করব বুঝতে পারছি না।

ওর এই স্বভাবটা আমিও বুঝি না।

যা হোক, ওর সামনে নতুন করে মাথা খাড়া করে দাঁড়াও।

বিশ্বাস করো, কেন যেন আমি পারি না। ওর ওপর নির্ভরশীলতা ওর সামনে আমার ব্যক্তিত্ব ছোট করেছে, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। কিন্তু দুম করে নিজের প্রকৃতি পাল্টাই কী করে ?

গলা খাঁকারি দিয়ে বলি, এখন তুমি নিজ থেকে আর একটা ফোন দেবে না। আমাকে প্রমিজ করো।

ও যদি ফোন না দেয় ?

ক'দিন দেবে না। এক সপ্তাহ আমরা দেখব, এরপর ওর সঙ্গে আমরা পাকাপাকি কথার জন্য বসব।

এক সপ্তাহ ? নীলুর কণ্ঠ ভারী হয়ে ওঠে। আমার বুকটা মায়াবী জলস্রোতে আর্দ্র হয়ে ওঠে।

আমি নিজেকে সম্পূর্ণ পাল্টাই, ঠিক আছে, তুমি তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী যোগাযোগ রাখো। দেখা যাক বিষয়টা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ফোন রেখে নীলু বিছানায় আধশোয়া হয়ে জহিরের নম্বরে কল দেয় আর কাটে, ভাবে, সত্যিই কি ও তার সেটেলমেন্ট নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে ? আমি ওকে বুঝতে পারছি না বলে ওর রাগ হচ্ছে ? আমাকে এড়াবেই যদি, আমাকে বিয়ে করার জন্য সে শহর ছাড়ল ভার্সিটি ছাড়ল কেন ? ভেতরটা আঁধারে ছেয়ে যায়, না এখন থেকে ওকে বেশি ফোন দিয়ে বিরক্ত করব না।

শরীর জমে গেছে।

সিলিংয়ের নিচটায় কারুকার্যময় মাকড়সার জালের মতো যেন ছড়ায়িত। নিদ্রাহীন জলাতুর চোখ নিয়ে উঠে বসি, উড়তে থাকে কাগজ-কলম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো রাত অনিদ্রার সীমাহীন বিষ আবহের মধ্যে যখন ছটফট তখন আকাশটাকে ছোট করে দিয়ে সার সার ডানাওয়ালা হাতি ঢেউ খাচ্ছিল।

শুঁড় দিয়ে কেউ নক্ষত্র, কেউ চাঁদ থেকে সুধা রস পান করছিল। তালগাছের পাতার বদলে সেখানে দোল খাচ্ছিল কলাপাতা। স্বার্থপরেরা পুরো অঞ্চল ধরে গভীর ঘুমের নিঃশ্বাস ফেলছিল। ঘুমুতে না পারলে আমার চেয়ে দুঃখবতী আর কেউ হয় না। অনিদ্রার মুঠো চোখে আজ ঢেউ খাচ্ছিল দুখি সখির পরান কথা।

আমার কামড়ে ঢাকা দেহ ক্রমাগত ক্রন্দন করে, বেদনায়, লজ্জায়।

এর মধ্যে একি ?

আত্মজা এসে আমার নির্ভুল মুখে কালো শিম্পাঞ্জির মুখোশ এঁটে দিল যে পাকাপাকি ? হাঃ হাঃ, জব্বর হয়েছে।

এখন থেকে ওর সঙ্গে আমার আর দূরত্ব থাকবে না।

আমি যখন এইভাবে শূন্যে হাল ধরতে চাইছি, মনটা প্রচ্ছন্ন আলোয় ভরে গেল। আজ মিতুলের আর্টের রেজাল্ট আর পুরস্কার দেওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে টেনশনও, মিতুল কোনো সিন ক্রিয়েট করবে না তো ?

রূপ নয় গুণ—আজ যদি মিতুল ব্যাপারটা অনুভব করতে পারত ?

ভাঁজতোলা কপালকে মসৃণ করে আমি আর নীলু মিতুলের স্কুলে যাই। সুলতানা সময় বলে দিয়েছিল। সে ছোটাছুটির মধ্যেও আমার বেণি ধরে টান দিল। টেনশনে আমার গলা শুকিয়ে আসছিল। রোদ্দুর চারপাশে যেন লাল মখমলের আভা ছড়িয়ে রাখছে। এত টেনশন কোরো না, দেখবে মিতুল সবটা সামলে নেবে, নীলু বলে, দেখছ না আজকাল ওর ব্যবহার কত পজেটিভ হতে শুরু করেছে ?

কিন্তু এই আর্ট প্রতিযোগিতা নিয়ে মিতুল আমাকে কিচ্ছু বলল না, পজেটিভ হলে বলত না ?

ধীরে ধীরে সব ঠিক হবে। আর মিসেস মিলি সুলতানা তুমি একটু মিতুলের মা হওয়া কমাও। পারলে মুখে একটা ক্রিমও মাখো না। এতে কি তোমার সৌন্দর্য কমেছে ? তুমি তো উঠে পড়ে লেগেছ, কীভাবে নিজেকে কুৎসিত দেখা যায়। নিজে মেয়েটার সমান্তরালে না নেমে তুমি ওকে নিজের সমান্তরালে আনার চেষ্টা করে দেখতে পারো না ?

আমি ঠোঁট কামড়ে ধরি, ওর জন্মের আগে আর পরে আমার জীবনটা দিয়ে কী গেছে জানো না। আমার কী...

সরি সরি, উষ্ণ হাতে আমার হাত চেপে ধরে নীলু। চারপাশের পাহাড়গুলো যেন ডানা মেলে এই স্কুলের মাঠে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। খেলা করছে আলোছায়ার সঙ্গম।

নিজ চিত্তের আদলে মেয়েটাকে যদি গড়তে পারতাম ? রাশি রাশি বুদবুদ জমছে শিরাতে। মঞ্চের সামনের দিকেই আমরা বসেছি।

আচমকা ফাতনায় টান পড়ে।

মিতুলের নাম ডাকা হয়।

আমি কাঁপতে থাকি।

মিতুল ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে পুরস্কার নিয়ে ওকে কিছু বলতে বলায় সে আমাকে অতল গহ্বর থেকে মহা আসমানে উঠায় এবং অদ্ভুত সুন্দরভাবে হাসে মিতুল, আমার মেয়ের হাসি এত সুন্দর ? সেই শৈশবে দেখেছি, আজ কতকাল পর দেখলাম। মিতুল বলে, এই পুরস্কারটা আমি আমার মা'র কাছ থেকে নিতে চাই।

মা! মা!

বিহ্বল পা ঠেসে যেতে থাকে নিচ দিকে, খুশিতে উজ্জ্বলিত নীলু ধাক্কা দেয়, যাও।

এরপরে মঞ্চে কী হয়, আমি ছোট করে কী বলতে কী বলি, একটা স্বপ্নের ঘোরে কন্যাকে নিয়ে নিচে নেমে আসি। কিচ্ছু কেন হুঁশের মধ্যে থাকে না।

মঞ্চেও মিতুলের ছবির খুব প্রশংসা করছিলেন আয়োজক অতিথিরা।

নিচে নেমেও অনেক অভিনন্দনে যখন ভেসে যাচ্ছিল মিতুল, কারা যেন বলতে থাকে, এই চেহারার মেয়ের মা এত সুন্দরী ? নিজের বাচ্চা তো ? মিতুল সটান ঘাড় ঘুরিয়ে বিমর্ষ হয়ে যায়। আমার মাথায় বাজ পড়ে যেন।

আউলা ঝাউলা অনুভব নিয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁপছিলাম, মিতুল যদি ক্রেস্টটা উড়িয়ে ফেলে দেয় ?

হিমহিমে এক বোধ নিয়ে বাড়ি ফিরি। এতক্ষণ নিজেকে সংযত রাখা মিতুল আমার ঘরের মধ্যে আছড়ে ফেলে ক্রেস্টটাকে, আর দাঁতে দাঁত পিষে বলে, তোমাকে মঞ্চে ডাকাটাই আমার ভুল হয়েছে সুন্দরী। তুমি যদ্দিন আমার পাশে চলবে, কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। পারবে তুমি তোমার মাথাটা ন্যাড়া করতে, আমার জন্য পারবে ?

আমাকে হতবাক করে দিয়ে নীলু ওকে কষে থাপ্পড় লাগায়, চেহারার মতোই মনটাকে জঘন্য করে রেখেছ। আগে তুমি ন্যাড়া হও, এরপর মিসেস মিলিকে বলো। তুমি এমন কিছু হীরের টুকরো নও, তোমাকে আগলে রাখতে রাখতে তোমার মা'র দম শেষ হতে থাকবে। এই মেয়ে এত যে ফুটানি এই একটি মহিলার সঙ্গেই, তুমি তাকে এ জীবনে কী দিয়েছ ?

ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দেয় মিতুল।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার চেয়ে বেশি হতবাক আর স্তব্ধ হওয়ার কথা নীলুর, হুজুগে কাণ্ডটা করে ফেলে।

কিন্তু না, সে আমাকে হিড় হিড় টেনে বিছানায় বসায়, ওকে এই থাপ্পড়টা তোর দেওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। ওকে ?

ও কী ? মনে হয় তুই রাস্তায় পড়েছিলি। আর সে তোকে এখানে এনে খাওয়াচ্ছে পড়াচ্ছে। এখন তুই মাথা ন্যাড়া করার কথা ভাবছিস না তো ? তা যদি ভাবিস তবে তোরা আমার কাছ থেকে দূরে চলে যা।

ক্রোধে হিসহিস করতে করতে নীলু তুই করে বলছে ? এই কি জহিরের ওপর নির্ভরশীল মিনমিনে কান্নায় কথায় কথায় ভেঙে পড়া নীলু ?

অবস্থার আকস্মিকতায় নিজ রুমে মিতুল কী করছে, তা আর মাথায় আসে না। সত্যি বলতে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছি। রুদ্ধ বুক আটকে ভাবি, আসলেই অত ধার না ধারলেই হয়।

জগ থেকে পানি ঢেলে ঢক ঢক খেয়ে নীলু বলে, তুই নিজের জীবনটাকে নিজের ভাবিসই না। তোর নিজের একটা জীবন আছে। তুই

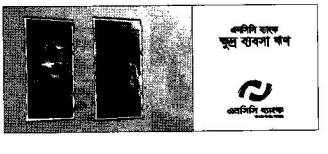

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা সংসার পেতে সুখে থাকার কথা ভাবতে পারিস, এ তোর কল্পনার বাইরে।

আমার কথা বলতে পারিস। জহির চলে যাওয়ার পর অনেকটা সময় আমি অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম। এরপর থেকে তো ছেলে খুঁজছি। আমার ব্যাংকে বড় পজিশন, ছেলেরা ভয়ে আসে না। আজকাল কম শিক্ষিত মেয়ের কদর বেশি। কাজ করতে বুয়া পাওয়া যায় না তো।

ওহ থামো, এমন পরিস্থিতিতেও আমার হাসি পায়। ধীরে ধীরে বিন্যস্ত হয় নীলু। বলে, প্রত্যেকটা মানুষ একটা গন্তব্য নিয়ে বাঁচে। তোমার গন্তব্য কী ? জানি বলবে মিতুলকে পাসটাস করিয়ে বিয়ে দিতে না পারলে বিদেশ পাঠিয়ে দেব ? দেখতে দেখতে সেই দিন এসে যাবে। তারপর তোমার জীবন ?

তোর সঙ্গে কাটাব।

এই ফাজলামো না, আমি থাকব না। এদ্দিন ডিভোর্সিদের পাত্তা দিই নি। নীলু বলে, এখন দেব। এখন থেকে বৃদ্ধকাল অব্দি একা নিজের জীবনটা কাটানো ভীষণ কঠিন।

আমাদের চারপাশে ঘূর্ণায়মান বিষাদের ছায়া। বুকের ভেতর ঘা লাগে যেন। এসব ব্যাপার ভাবনায় এলেই আমি তাড়িয়ে দিয়ে বর্তমানটা নিয়ে বাঁচি।

ঠান্ডা জলজ কণ্ঠে নীলু প্রশ্ন করে, প্রমিজ করো আমাকে সত্যি বলবে, একটা প্রশ্ন করব।

প্রমিজ।

শান্তনুকে তোমার কেমন লাগে ?

ভালো। এটা এত সিরিয়াসলি প্রশ্ন করার কী হলো ?

দেখো মিলি, তোমার জীবনটা আমার মুখস্থ। জিতু তোমার জীবনে আসার আগে দুজন দুজনকে ভালোবাসতে না ? দুজনই বুঝতে, কিন্তু প্রকাশ করো নি, হঠাৎ ঝড়ের মতো জিতু এসে সব উল্টে দিল।

বাদ দাও, তখনকার অনুভূতির সঙ্গে জীবনের এত নোনাজল পেরিয়ে এখনকার অনুভূতিও এক থাকবে তা কেন ভাবছ ?

তুমি আসলে মন্টুকে জীবনের জন্য জিতিয়ে দিয়েছ।

কেমন ?

মন্টু তোমার জীবনে আসার আগে তোমার লাল দোপাট্টা মখমল জীবন ছিল। মন্টু হায়েনার মতো তোমাকে কব্জা করে একেবারে নিজ চেহারার একটা বাচ্চা তোমার ওপর ফেলে চলে গেল। মৃত্যুর পর মন্টুর আত্মা দেখছে আর তালি দিচ্ছে। তুমি তার সেই মেয়ের জন্য জীবনটা বিকিয়েও তার মন পাচ্ছ না। তাকে তুমি তোয়াজ করে থাকো। আমি একটা স্পষ্ট কথা বলছি আজ, সিরিয়াসলি নিয়ো, তুমি শান্তনুর সঙ্গে জীবনটা ভাবো। ও তোমাকে যেভাবে বোঝে, আর কেউ বুঝবে না, এতে মিতুলের প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবছ ? সে তো শান্তনুকে বিয়ে না করেই খুব কি ভালো আছো ? কী করবে ও ? বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ? জীবনেও না, গেলে তোমার সঙ্গে যা অবস্থা হয় ওর, অনেক আগেই চলে যেত।

আমি দাঁড়াই, দেখি একটু মিতুলটাকে, এর আগে মার খায় নি তো।

টান দিয়ে নীলু বসায় আমাকে, সুইসাইড করবে ? তা-ও না, এটা করার হলে যত অপমান সহ্য করে এই অব্দি এসেছে, তা না এসে বহু আগেই করত।

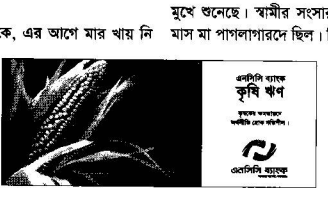

মেঝের পাজর ফুঁড়ে ধূপের গন্ধ আসছে। কেমন একটা বিমোহনের মধ্যে পড়ে যাই। যেন এক ছলকে কালো মেঘ সরে গেল। মিতুল ধূপ জ্বালিয়েছে ? থাপ্পড় খাওয়ার পরও ?

নীলু নিজের ঘোরেই আবর্তিত, আসলে জেনেটিক ব্যাপারটা ভয়াবহ। চৌদ্দপুরুষের কারও একজনের কোনো রোগ থাকলে তার বংশধরেরা পায়। দুর্ভাগ্যবশত মিতুল বাবার আদলের সঙ্গে সঙ্গে বাবার স্বভাবটাও পেয়েছে, আরে ধূপ জ্বালাল কে ?

মিতুলের ঘর থেকে আসছে। ও প্রায়ই জ্বালায়।

এই অবস্থায় মিতুল ধূপ জ্বালিয়েছে, নীলু হাসে, বলে না, মাইরের উপরে ওষুধ নাই।

নীলুর ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরি।

নীলু ধীর কণ্ঠে বলে, সত্যি থাপ্পড়টার জন্য এখন খারাপ লাগছে। আমিও কি ওকে কম ভালোবাসি ? আমি বাইরের একটা মানুষ চড় মারলাম, অপমানে অপমানে আমাকে জর্জরিত করতে পারত ? কিন্তু টুঁ শব্দটি করল না, এখন ধূপ জ্বালিয়ে আমার নিভৃতে চলতে থাকা অপরাধবোধের মধ্যে পানি ঢেলে দিল। পরে এসে ক্ষমা চেয়ে নেব, যাই করুক, হাত ওঠানো ঠিক না।

একসময় নীলু ওঠে, যেতে যেতে বলে, ফের শান্তনুর নাম সেন্ট করলাম। আত্মায় সেইভ করার অন্তত চেষ্টাটা করো বন্ধু।

মিতুল আখ্যান

সাপের মতো প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে ধূপকাঠি থেকে ধোঁয়া উড়ছে। মিতুল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এক অদ্ভুত নিভৃত বিষাদের ছায়া তাকে গ্রাস করে থাকে। আজ নীলু খালার থাপ্পড়টা খাওয়ামাত্র মিতুলের ইচ্ছে হয়েছিল নীলু খালার চুলের কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নেয়। মিতুলের প্রকৃতিজাত জেদ তাকে তাই ভাবাচ্ছিল। যার ওপর মিতুলের কন্ট্রোল খুব কম থাকে।

নীলু খালা যদ্দূর সুযোগ পায়, মিতুলের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করে। ভাগ্যিস দরজাটা বন্ধ করে নিজের জেদ থামাতে মেঝেতে বসে কষে নিজের চুল খামচে ধরেছিল।

ধীরে ধীরে কান্না আসতে থাকে।

মনে মনে প্রার্থনা করে, তাকে থামাতে মা যেন এখন এ ঘরে কিছুতেই না আসে। ভাগ্যিস মা আসে নি। আজ থাপ্পড়টা মা দিলে নিশ্চিত মিতুল উল্টো তার ওপর চড়াও হতো।

সে টের পায়, তার প্রবণতার গভীরে একটা গোপন গোখরো বাস করে। যাকে সামলে চলতে হয় বলে সে প্রায়ই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

মা'র সঙ্গে সে কেন আছে ?

পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই বলে ?

না, তার তো দাদা আছে। ঠিকানাও আছে, সে যায় না কেন ? বোঝার বয়স থেকেই সে পৃথিবীকে দেখেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। নানুর মুখে শুনেছে। স্বামীর সংসার থেকে ফিরে আসার পর বেশ অনেক মাস মা পাগলাগারদে ছিল। মিতুলকে কোলে করে এনে নানুর কোলে ছেড়ে দিয়েছিল। তখন মিতুলের এক মাস বয়স।

বড় হতে হতে মিতুল হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, সন্তানের মধ্যে বাপের ছায়া দেখে মা'র উদ্‌ভ্রান্তি কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমে ক্রমে মা স্বাভাবিক হতে থাকলে মিতুল কোলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বলত, আসলে মা সুন্দর, আমি পচা।

কে বলেছে তোমাকে এই কথা ?

কেন সবাই বলে।

ক্রমশ রৌদ্রে, অন্ধকারে যত দিন যায়, মাকে সরলভাবে বলা এই কথাগুলোই মিতুলের জীবনের বিষ হয়ে ওঠে। নানা-নানুর মৃত্যুর আগে মা'র সঙ্গে সে কোথাও গেলে এক প্রশ্ন ? এটা তোমার বাচ্চা ? দত্তক নিয়েছ ?

আজ এখন মিতুল এতটা শান্ত, আজ তার খারাপ লাগছে। মঞ্চেও উঠে মা ডাক শুনে মা'র হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলা। এরপর স্টুডেন্টরা এমন নতুন কী এমন বলল, সে ক্রেস্ট ছুড়ে ফেলে মাকে ন্যাড়া হতে বলল ? আসলে দীর্ঘদিন মা'র সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় না তার। নিজের ঘরে ছিটকিনি লাগিয়ে নিজের মতো বাস করে সে।

অনেক দিন পর এসব মন্তব্য শুনে পুরোনো দিনের দুঃখ, কষ্টগুলো ঘাই দিয়ে উঠেছিল।

মা'র সৌন্দর্য তার কাছে অভিশাপ। ক্রমে ক্রমে এমনও হয়েছে, মা'র চেহারাটাকে তার কাছে সাপিনীর মতো লাগতে শুরু করল। তার মুখের মায়া যেমন মা ছাড়া কেউ দেখে না, মা'র এই সাপিনী রূপটাও সে ছাড়া কেউ দেখে না।

এটা হয়েছে একদিন দাদার কাছ থেকে ভয়ংকর সব কথা শুনে শুনে।

কাজের মানুষ আর মিতুল ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিল না। দাদা নানার বাড়ি এসেছিল। দাদা তাকে অনেক আদর করে। শেষে ধীরে ধীরে মিতুলকে জানায়, মা স্টাইল করে চলত। এক গাদা গুণ্ডা মাকে পাকড়াও করে, সিনেমার হিরোর মতো বাবা মাকে রক্ষা করলে মা তার প্রেমে পড়ে যায়। দুজন পালিয়ে সংসার পাতে।

এর মধ্যে মিতুল গর্ভে এলে মা আরেক সুন্দর ছেলের প্রেমে পড়ে। ওটাও একটা গুণ্ডা। বাবা টের পেয়ে ওই ছেলেকে হেভি পেটায়।

একদিন বাবা ঘরে ছিল না, যে-কোনো সময় বাবা আসতে পারে, এই ভেবে মা ছেলেটাকে এড়াচ্ছিল। ছেলেটা মাকে একা পেয়ে কামড়ে-হেঁচড়ে বের করে পালিয়ে যায়।

মিতুলের চোখ বড় বড় হয়ে যায়। বারো বছরের মিতুল যা বুঝতে পারছিল না দাদা লজ্জার মাথা খেয়ে ভাবসম্প্রসারণ করে করে মিতুলকে বুঝিয়েছে। আমি তো অন্যরকম শুনেছি—মিতুল যেই বলতে যাবে দাদা ঘর থেকে ধর্মগ্রন্থ আনিয়ে সেটা ছুঁয়ে কিরা কাটে এবং মিতুলকেও কিরা কাটায় দাদা যে এসব কথা বলেছে, তা যেন কাউকে না জানায়।

তাই তো। ছোট থেকেই তো মিতুল দেখেছে ছেলেগুলো মাকে দেখলে কেমন হামলে পড়ে। মিতুলের বিশ্বাস দৃঢ় হয়, সঙ্গে সে না থাকলে মা-ও নিশ্চয়ই হামলে পড়ত।

বাবা সম্পর্কে কারও কাছ থেকে মিতুল তেমন শোনে নি। নানুরা তাকে আগলে রাখত, আর আট-নয় বয়স থেকে মিতুল সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। তবে শৈশব থেকে একটা কথা শুনেছে, মেয়ে তো দেখছি বাপের ফটোকপি। এটাই তার যুক্তিহীন কিন্তু প্রবল ক্রোধের জায়গা। কেন মা ভালোবাসে বলেই এমন চেহারার একটা মানুষকে বিয়ে করতে গেল!

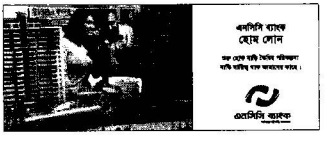

মিতুলের এই চেহারার জন্য মা দায়ী।

দাদা বলছিলেন, আমার সঙ্গে যাইবা ?

নানা নানুকে ছেড়ে যাবে ভাবলেই মিতুলের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত।

বড় হতে হতে মিতুলের প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা বদলাতে থাকল। মা'র চোখের সামনে সে একটা কাঁটা হয়ে ঝুলবে। মিতুল কি দেখে নি, কিছু কুকুটে মানুষের 'বাচ্চাটা কার' জাতীয় প্রশ্নে মা-ও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় ? কিন্তু শুধু মার সঙ্গে বান্দরবানে আসা হতো কি না সন্দেহ। মৃত্যুর আগে নানু প্রমিজ করিয়েছিলেন, সারা জীবন যাতে মার সঙ্গে থাকে সে।

আমার যদি বিয়ে হয়ে যায়, চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পা নাড়াতে নাড়াতে প্রশ্ন করেছিল মাকে মিতুল।

তখন শ্বশুরবাড়ি যাবে। মা কী তখন এত খুলে কথা বলার অবস্থায় ছিল ?

না নানু ভেবেছে, আমার যা চেহারা, আমাকে আবার বিয়ে করবে কে ?

তুমি নানু সম্পর্কে এইসব বলতে পারলে ?

সরি সরি। মিতুলের চোখে জল এসে যায়। নানা-নানুর মৃত্যুতে মা এবং মিতুল দুজনের মাথায়ই আসমান ভেঙে পড়েছিল।

মা'র প্রতি অনেকটা দিন ধরেই মিতুল শান্ত, বন্ধু শান্তনুর জন্য। মিতুল, তার সব অনুভব শান্তনুকে শেয়ার করে। শর্ত দেয়, আমাদের মধ্যে ম্যাডাম মিলিকে নিয়ে কোনো কথা হবে না। তোমার কি তার সঙ্গে কথা হয় ?

এখন তুমিই কিন্তু ম্যাডামকে নিয়ে কথা বলছ, শান্তনু বলে, তুমি তার সঙ্গে আমাকে নিয়ে কথা বলেছ জানলে আমি জীবনেও তোমার সঙ্গে কথা বলব না। কম কম যোগাযোগই রাখি। সে তার আমাদের বন্ধুদের নিয়ে কথা বলে, স্কুলের গল্প বলে, তোমরা দুজন তো দুজনের চেহারাই দেখো না সারা দিন, তোমাকে নিয়ে কী কথা থাকবে ?

কে বলেছে এ কথা ? ম্যাডাম মিলি ?

না, তুমিই বলেছিলে, ভুলে গেছ ? আচ্ছা, তুমি কি মিলিকে মা বলে ডাকো না ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মিতুল বলে, মা-ই তো ডাকি, তোমার সামনে ফাজলামো করলাম আর কি।

দরজায় নক করে মা রুমে নিঃশব্দে খাবার দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। মিতুলের খাওয়ার কথা মনেই পড়ছে না।

সে মোবাইলের সুইচ টেপে। আজকাল বন্ধু শান্তনু কাজ নিয়ে অনেক ব্যস্ত থাকে। তাই কথা বলা অনেক কমে গেছে। একা নিমগ্নতায় হাঁপিয়ে ওঠে মিতুল। অন্ধক্রোধে দিশাহীন অনুভব করে। মোবাইল হাতে নিয়ে ভাবে, এখনো যদি সে ব্যস্ত থাকে, তবে মিতুল তাকে ফোনই করবে না।

বন্ধু শান্তনু ফোন ধরে, কেমন আছ প্রজাপতি ?

সমস্ত শরীরে শিহরন বয়ে যায়। তার মতো অসুন্দর মেয়েকে শান্তনু কখনো পাখি, কখনো কাঠবিড়ালি ডাকে।

বিস্তার করে থাকা ছায়া ভেঙে হেসে ওঠে মিতুল। বুঝতে পারে এখন শান্তনু ব্যস্ত নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ? অনেক ভালো আছি। আজ স্কুলের আর্ট এক্সিবিশানে আমি ফার্স্ট হয়েছি।

ওয়াও! অভিনন্দন।

মা-ও গেছিল।

এই থামো থামো, কে গেছিল ?

ইতস্তত ভঙ্গিতে একটু কাশে মিতুল বলে, আজ তাকে আমি মঞ্চে মা বলে ডেকে তার কাছ থেকেই পুরস্কার নিয়েছি।

শান্তনুর কণ্ঠ ভিজে আসে, এমন অসাধ্য সাধন হলো কী করে ?

আসলে মা নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছে আমার ব্যাপারে। আমি ক্ষিপ্ত হই, রাগ করি সুখে বা দুঃখে থাকি এর

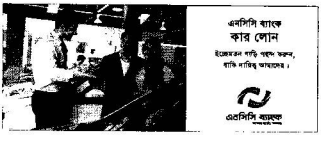

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো খোঁজ নিতে আসে না। মা এগুলো করতে এলেই আমার সঙ্গে লেগে যেত। বিয়ের আগে বা বিয়ের পর আমার বাবাকে ফাঁকি দিয়ে মা'র যে চরিত্র স্খলন হয়েছিল, সেটাও এখন তার মধ্যে নেই।

কী ? কী বলছ ? ঘোলাটে শোনায় শান্তনুর কণ্ঠ, বিয়ের আগে বা পরে তোমার মার চরিত্র স্খলন ? মানে!

সঙ্গে সঙ্গে দাদার কসমের কথা মনে পড়ে যায়। নিজেকে সামলে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে, না, এমনিই বললাম। লোকদের মুখে ফাউল কত কথা শুনতাম না ?

তুমি বিশ্বাস করো সেগুলি ফাউল ?

চড়ে ওঠে মিতুল, তুমি দেখি ওই মহিলার প্রসঙ্গ এলে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ো।

মিতুল! ঠান্ডা কণ্ঠে বলে শান্তনু, তোমার মা আমার কাজিন। জন্মের পর থেকে আমরা একজন আরেকজনকে চিনি। প্রগাঢ় নৈকট্যের মধ্যে আমরা বড় হয়েছি। তুমি পছন্দ করো না জেনে এখন সে আমার সঙ্গে কথা না বললেও চলে। আজকে এত সুন্দর একটা মিলন হলো তোমাদের। এরপরও তোমার বদল ঘটল না ?

মিতুলের চোখের সামনে ছায়া বিস্তার করে আছে। সে ধীর কণ্ঠে স্কুলে স্টুডেন্টদের মন্তব্য আর ঘরে এনে ক্রেস্ট ফেলে দেওয়ার গল্প বলে, মা'র মাথা ন্যাড়ার কথা চেপে যায়।

শান্তনুর ভেতর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছায়া প্রলম্বিত হয়। দিলে তো একটা অসাধারণ মুহূর্তের সৌন্দর্য মায়ার মধ্যে জল ঢেলে ? আমি ভাবছি আগামী মাসে আসব না।

আছড়ে পড়ে মিতুল, কেন ? আমি তোমাকে আমার এমন ঘটনা নতুন বলছি ? আমার সবই তো জানো তুমি। আজ এমন নতুন কী বললাম, তুমি আসবে না বলছ!

শোনো মিতুল, গলা খাঁকারি দেয় শান্তনু। তোমার জন্মের আগে থেকে মিলি আমার বন্ধু। তুমি মাঝে মাঝেই তোমার মাকে চরিত্রহীন বলেছ। আমি এই জীবনে তার চরিত্রস্খলন দেখি নি। তুমি কেন সেইসব বলেছ, তুমিই জানো। আমাকে বলেছ, খুব কাছের একজনের কাছ থেকে অনেক কিছু জেনেছ, সে প্রমিজ দেওয়ায় তুমি কিছু বলতে পারবে না। আমি তোমার জন্য আমার জন্মকালের বন্ধুর সঙ্গে দূরত্ব এনেছি। তোমার জীবনের পরমভাগ্য এমন একজন মা পেয়েছ। শুধু তোমার জন্য সে নিজের জীবনটা শূন্য করে রেখেছে।

ফের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মিতুল, ও আমার জন্য ? নইলে সে বিয়ে করে শূন্যস্থান পূরণ করে বাঁচত ? তা করুক না সে বিয়ে ? আমি তাকে আটকেছি নাকি ?

সত্যিই সে বিয়ে করলে তোমার কিছু এসে যায় না ?

না। তার কিছুতেই আমার কিছু এসে যায় না।

কথাটা মনে রেখো কিন্তু।

রিসিভার রেখে দেয় শান্তনু।

১২

অ্যাকুরিয়ামের মাছের মধ্যে ঘাই খেয়ে খেয়ে নিজ ঘরের দেয়ালে ঠোকর খায় মিতুল।

মা বিয়ে করলে তো মিতুলের আসমান জমিন উল্টে যাবে। কোনো এক ব্যাটা এসে মার সঙ্গে শোবে। মিতুলকে শিম্পাঞ্জিও বলতে পারে। তাদের ঘরে সন্তান হবে।

নিজের জগতের মধ্যে নিজ শান্তিতে এই যে মিতুলের বাস, তার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটে যাবে।

বন্ধু শান্তনু যদি মার জন্য ছেলে দেখতে থাকে ? এমনিতেই নীলু খালাও মাঝে মাঝেই মাকে বিয়ের জন্য উস্কায়। মা'র সঙ্গে তো মিতুলের বনিবনা নেই। মা কেন মিতুলের কথা ভাববে ?

ভয়ে মিতুলের আত্মা ছারখার হয়ে যায়। সে ভাবে, শান্তনুকে ফোনে বলবে, সে কিছুতেই মা'র বিয়ে চায় না। কিন্তু সে যে জোর কণ্ঠে শান্তনুকে বলেছে। এরপর ফোন করে এ কথা বলবে ভাবতেই নিজেকে কেঁচোর মতো লাগে। তুমুল অস্থিরতায় তুঙ্গে গিয়ে ফের মোবাইলে আঙুল চাপে, বন্ধু শান্তনুর ফোন বিজি পায়। ও কি মার সঙ্গে মা'র বিয়ে নিয়ে কথা বলছে ? ভাবতেই একেবারে কুঁকড়ে উঠে মিতুল। খড়খড়ে গরমে তার কণ্ঠ শুকিয়ে আসে। জলস্তরে মিতুলের কান অব্দি ডুবে গেলে হাঁসফাঁস করে মা'র ঘরে যায়। মা'র কান থেকেও রিসিভার নামছে।

মা-ও কি তাহলে একটা বিয়ের জন্য লোভী হয়ে আছে ? মিতুলের জন্য পারছে না ?

এই ব্যাপারটা তো এদ্দিন ভেবে দেখে নি। মা'র ওপর যেভাবে সে হামলে পড়ে নিজের প্রকৃতির ওপর কন্ট্রোল হারিয়ে, মা যদি তিতিবিরক্ত হয়ে ওকে ফেলে কারও সঙ্গে চলে যায় ?

বাবা থাকতে মিতুলকে পেটে নিয়ে যে প্রেম করতে পারে, তার স্বভাব কি এত জলদি ঠিক হয়ে যেতে পারে ?

নিজেকে বহু কষ্টে স্থিত করে সে মা'র বিছানার কাছে যায়। চোখে হাত দিয়ে মা শুয়ে পড়েছে।

পায়ে জোরে শব্দ করে মিতুল।

মা হাত সরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বসে। পারতপক্ষে মিতুল মা'র ঘরে আসেই না। মা'র চোখে বিস্ময়।

মা'র চেহারায় নার্ভাসভাব দেখে প্রথমে মায়া হয় মিতুলের। মা তাকে এত ভয় পায় ?

মুহূর্তে দাদুর কথা মনে পড়ে। মা নাকি যে কারও সামনে নাটক করতে পারে। তখনই ধীরে ধীরে মা'র সাপিনী রূপটা উদ্ভাসিত হতে থাকে।

কিছু লাগবে ?

মা'র প্রশ্নে মিতুলের ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ জমা হয়, করুকগে মা বিয়ে। সে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবে।

না, এমনিই। তুমি খেয়েছ মা ?

ফের মা বলে সখোধনে মা'র চোখে জল জমা হয়, মা দুহাত উড়িয়ে মিতুলকে বুকে টানতে চায়।

এত আবেগঘন মুখটা থেকেও সাপিনী সরছে না। মিতুল উল্টোদিকে ঘুরে দ্রুত পায়ে নিজ ঘরে ছুটে আসে।

শান্তনুর ফোন বিজি ছিল। মা কান থেকে রিসিভার রাখছিল। মিতুলের অনুমতি পেয়ে শান্তনু আর দেরি করে নি মাকে খবরটা জানাতে। তবে কি মা শান্তনুকে দায়িত্ব দিয়েছিল নিজের বিয়ের ব্যাপারটায় মিতুলের অনুভূতি জানতে ? শুধু মিতুলকে টেনে জীবন কাটাতে মা'র অসহ্য লাগছে ?

ফুঁপিয়ে কাঁদে মিতুল।

ফের ফোন দেয় বন্ধু শান্তনুকে।

শান্তনু ফোন ধরে বলে, এখন থেকে তোমার মা'র প্রসঙ্গে কথা বলা যাবে না, এমন নিয়ম আমি মানব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মা'র সঙ্গে আমি কথা বললে তুমি মাইন্ড করতে পারবে না। বেচারি একাকী একজন নারী। আবারও বলছি আমার শৈশবের জন্য। তোমার ভয়ে আমি কেন তাকে একাকী মরতে দেব ?

কে বলেছে একাকী ? স্তব্ধ কষ্টে দম আটকে আসতে থাকে মিতুলের। স্কুলের টিচাররা আসে। এ ছাড়া নীলু খালা তো আছেই। নিঃসঙ্গ আমি। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। সেই তুমিও মা'র দলে চলে যেতে চাইছ ? ঠিক আছে, তোমার যা ভালো লাগে করো, আমাকে আর ফোন দিতে হবে না। ফোনের সুইচ বন্ধ করে বালিশে মুখ চেপে ফুলে ফুলে কাঁদে মিতুল।

কঠিন ইন্দ্রজালের প্রচ্ছায়ায় মিতুলের দেহ ঝাপসা হয়ে আসতে থাকে।

হামাগুড়ি দিয়ে অনন্ত নামছে।

মিতুলের জীবন থেকে এখন শান্তনু হারিয়ে গেছে। মিতুল এক গভীর গহ্বরে তলাতে থাকে। তার চারপাশের পৃথিবীটা শূন্য হয়ে আসে।

অনেকক্ষণ এভাবে পড়ে থেকে মিতুলের মনে হয়, হোক মা'র সঙ্গে কথা, মাকে নিয়ে কথা। বন্ধু শান্তনুকে বাদ দিয়ে মিতুলের পৃথিবী অচল।

অনেক কষ্টে নিজেকে চেপে রেখেও হাল ছেড়ে শান্তনুকে ফোন দিতে রিসিভার হাতে তোলে মিতুল।

কেন এসেছিল মিতুল আমার ঘরে ? ওকে সম্পূর্ণ অচেনা লাগছিল। সুলতানা রাতের আড্ডার জন্য ফোন দিয়েছিল। আজকে একেবারে মুড নেই, তা জানিয়ে চোখে হাত দিয়ে পড়েছিলাম।

স্পষ্ট মনে হচ্ছিল মিতুল কিছু বলতে এসেছিল। কেন যে মেয়েটা স্বাভাবিক কথাগুলো কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না!

জ্যোতিষ্কের মতো আমার দেহ ভাসতে থাকে।

আঁধারের পরিব্যাপ্তি সীমানা ছাড়িয়ে যায়। ইস্কুলে ক্লাস নিই নিজেকে ঠেলে ঠেলে।

আমার প্রেম পরিণতি পেল না। দাম্পত্য সুখ কী জানলাম না। কী করব এই রূপ নিয়ে ? মনে হয় কয়লা চটকে মুখে মেখে ঘুরতে থাকি।

নয় মাথাই ন্যাড়া করে নিই।

স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিই।

মিতুলের জন্মের পর তার সর্বাঙ্গে মন্টুর আদল দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

মিতুল বলত জন্মের পর আমাকে মেরে ফেল নি কেন ? এখন প্লাস্টিক সার্জারি করে তোমার মুখটা আমাকে দাও।

এমন অসম্ভব কথা কেন বলিস ?

এটা অসম্ভব কিছু না। তুমি এটা করতে পারবে না, সেটাই বলো।

ধীরে ধীরে আমি থিতু হয়েছিলাম, আমি নিজেই আমার চেহারা ঝলসে দেব।

এ নিয়েও কত হিসহিস করেছে, আমি কালো আমি অন্ধকার বলেই আমার চেহারা সুন্দর একটা আদল পাক-চাওলা। তুমি মুখে মুখে বলো, আমার চেহারাতে মায়া, আদতে হাড়ে হাড়ে তুমি বিশ্বাস করো। আমার চেহারা রাতের মতোই ঘুটঘুটে।

মৃদু কণ্ঠ উচ্চকিত করি, সত্যিই তোর চেহারার একটা আদলে কত মায়া তুই জানিস না ?

আমাকে ফালতু বুঝ দিয়ো না। তোমার সব ভাঁওতাবাজি আমি বুঝি। তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্মের পর আমার চেহারা দেখে খুশি হয়েছিলে, তোমার পাশে আরেকটা সুন্দর মুখকে সুন্দর দেখাবে না। তোমার তো এসব মুখ পছন্দ, নইলে বাবাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে কেন ?

তোকে কে বলল এসব, আমি পছন্দ করেছি ? এরপর ভাবি, আমার সমস্ত ঘটনা ওকে খুলে বলি।

কিন্তু ওর মনোভাবের বারণ করেছে। অন্তত এসএসসিটা পাস করুক। এই বয়সে এসব কথা হিতে বিপরীত হতে পারে।

যেনবা মহাগহ্বর থেকে ছিটকে ওপরে উঠে ধপাস মাটিতে পড়ি। ওর প্রতিটি কথা আমার অস্তিত্বকে ফালাফালা করে দেয়।

অথচ দুই কী তিন বছরে নিষ্পাপ আমার মুখ আজলা করে ধরে বলত, আমার সুন্দর পরি মা। বড় হতে থাকল আর চারপাশের মানুষের মন্তব্যের বাণ ওকে কুঁকড়ে দিতে দিতে জেদি করে তুলল।

অকুল পাথারে খড়কুটোর মতো ভাসতাম। যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছি, ওর মতোই অসুন্দর দেখতে মেয়েকে ইঙ্গিত করে বলতাম, দেখেছ ওকে ? কী সুন্দর হেসে গল্প করছে। আর তুমি তো হাসতে ভুলেই গেছ। আমার কথার ওপর আছড়ে পড়ত সে, ওর পাশে তো আর তোমার মতো সুন্দর মুখ নেই যে কম্পেয়ার করে ওকে কেউ আঘাত দিয়ে কথা বলবে!

মেয়ের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে ভিক্ষে চেয়েছি, আমাকে হেল্প কর। বোরকা পরি ?

আহা! ঠোঁট উল্টায় মেয়ে, সে নাহয় বাইরে পরবে। যেখানে যাবে, সেখানে গিয়ে তো খুলবে।

আমি এখন কী করব ? কী করলে তোর সুখ ?

মেয়ে হিসহিস করে, তুমি আমার কাছে পড়ে আছ কেন ? মানুষকে মহত্ত্ব দেখাতে ?

আমি চলে গেলে তুই কার কাছে থাকবি ?

ভিক্ষে করব।

এইবার কঠিন হয়েছিলাম, যা ভিক্ষে কর গিয়ে। থাকিস না আমার কাছে।

ছায়া ফুঁড়ে বজ্রপাত হয়।

এই তো আসল রূপ বেরিয়েছে। আমি গেলে তুমি একটা বিয়ে করতে পারবে।

আজ ভেতরটা যখন মিহি সুখে উল্লসিত, কেন আমার পুরোনো দুঃসহ স্মৃতি মনে পড়ছে ? শান্ত মেয়ে আমাকে মা বলে ডেকেছে। মাঝে ক্রেস্ট আছড়ে ফেলে একটা থাপ্পড় খাওয়ার পরও আমাকে মা ডেকে আমার খাওয়ার খোঁজ নিয়েছে। ইচ্ছে করে ওর রুমে গিয়ে ওকে জড়িয়ে নিজের সঙ্গে ল্যাপটে রাখি।

দরকার নেই ঝুঁকি নেওয়ার। যে হাড়ে ওর মুড বিবর্তিত হয়, মাঝখান থেকে আমার ভালো অনুভবটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তো ফেলে দেওয়া যায় না।

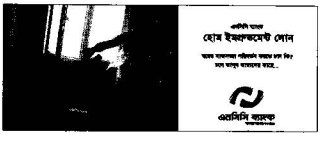

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

এর মধ্যে আমাকে দিশেহারা, বিস্মিত, আনন্দিত করে মিতুলের জীবনেও প্রেম আসে। দেখতে অসুন্দর ক্লাসের একটা ছেলে মিতুলের দিকে ফ্রেন্ডশিপের হাত বাড়ায়। ছেলেটার চোখে গভীর বেদনা দেখে মিতুলও নিজ অজান্তে হাত বাড়ায়।

চলো মাঠে যাই।

মিতুলের বিস্ময় চরমে। তার জীবনে এমন ঘটনা প্রথম। ছেলেটা বলে, তুমি এত সুন্দর ছবি আঁকো এত সুন্দর গুণ তোমার তারপরও সবাই তোমাকে এত ইগনোর করে! তোমার কষ্টটা আমি বুঝি। মনে করো না ছেলে বলে আমি মাফ পেয়ে গেছি। সুন্দরী মেয়েরা আমার দিকে ঘৃণার চোখে তাকায়।

তখনকার মিতুলকে দেখলে আমি রোমাঞ্চিত আনন্দে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়তাম যেমন, তেমন ব্রেকআপ হলে মিতুল কীভাবে সামলে দেবে, এই ভয়ে কাঁপতাম।

প্রেমে পড়ার পর মিতুল অন্য মানুষ হয়ে গেল। লজ্জায় লজ্জায় আমার ঘরে এসে আয়নাটা নিজ ঘরে নিয়ে গেল। পার্লারে গিয়ে ফেসিয়াল করা, চোখে ঘন কাজল টিপ... আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম, ওর সলজ্জ মুখের কম্পন!

একদিন বললাম, নিয়ে আসিস ছেলেটাকে।

আচমকা যেন বিদ্যুৎ লাগল মিতুলের শরীরে, লাফ দিয়ে বলে, পাগল! তোমার সামনে আনব ?

আমার ভেতর হিম স্রোত বয়ে যায়।

এখনো মিতুল কাছে না থাকলেও কেউ যখন বলে, কীভাবে এক বয়সেই আছেন ? যত দিন যাচ্ছে, রূপ তো খুলছেই। যতই মাথা ডুবিয়ে তেল দেন, সাজসজ্জা না করেন, আপনার সহজাত যে রূপ তা কিছুতেই ঢাকবে না।

রূপ! রূপ! অসহ্য! আমার দেহ হুল ফোটায় কেউ।

একদিন আমার কলজে টুকরো করে মিতুল এসে ক্ষোভে, কান্নায় ভেঙে পড়ল। ছেলেটা আরেকটা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে সরে গেছে।

আমি যত আকুলভাবে ওকে বুকে চেপে ধরতে চাই, তত সে আমাকে মরিয়া ধাক্কায় দূরে ঠেলতে থাকে। পৃথিবীটা তোমাদের মতো রূপসীদের। নিজেকে আমি শেষ করে দেব।

আমি হাল না ছেড়ে ওকে আঁকড়েই থাকি, বলি আমার মতো কেন বলছিস ? জন্মের পর থেকে তোর ছায়া নিয়েই তো আমি পড়ে আছি। আমার রূপ নিয়ে আমি গেছি কারও কাছে ?

কিছুটা ধাতস্থ হয়।

দুদিন পর বারান্দায় বসে আছি, চারপাশ নির্জন। পাহাড়ি বাতাসের ঘ্রাণে আচ্ছন্ন বোধ করছি।

মিতুল আমাকে বিহ্বল করে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মা, ওই ছেলেটা সুন্দরী মেয়ের কাছে যাওয়ার আগে তোমাকে ঘর থেকে বেরুতে দেখেছিল। একে ওকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে, তুমি আমার মা। সে তীব্র কণ্ঠে বলেছিল, তুমি এই মায়ের সন্তান হতেই পারো না। দেখো খোঁজ নিয়ে, অবৈধ হয়ে ডাস্টবিনে পড়েছিলে—এরপর ওকে আর বলতে দিই নি, কষে থাপ্পড় মেরেছি।

এই না আমার বাহাদুর মেয়ে। চুমোয় চুমোয় ওর মুখ ভরিয়ে ফেলি। বলি, প্রমিজ করো, এমন একটা ফালতু ছেলের জন্য মন খারাপ করবে না। ওর অস্তিত্বই তুমি ভুলে যেতে চেষ্টা করো।

আমার কথা রেখেছে মিতুল।

ওই ছেলের প্রসঙ্গে ঘুণাক্ষরেও মিতুল আর কথা বলে না।

১৪

রাতে হইচই করতে করতে সুলতানা আর নীলু হাজির, আপনার মুড অফ বলে আমরা আপনাকে একা ঘরে ছেড়ে দিতে পারি ? কী রান্না হচ্ছে ? রাতে খেয়ে যাব।

আমি হাসতে থাকি। না, আমার আর মুড অফ নেই। কন্যার মুখ থেকে মা ডাক ফিরে পেয়েছি, এর চেয়ে আর কী সুখ থাকতে পারে ?

তোকে দেখলামও মিলি, সুলতানা হাসে। মেয়ের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। ম্যাক্সিম গোর্কির মা-ও ফেল।

কী যে বলিস, পড়তি আমার মতোন অবস্থায়, বুঝতি।

আচ্ছা আচ্ছা, এইসব কথা বাদ থাক, নীলু বলে, একটা খবর আছে।

কী ?

একটা ছেলের সঙ্গে কথা শুরু হয়েছে সবে, বিজনেসম্যান, আমাদের ব্যাংকে এসেছে বেশ ক'বার। ওই সূত্রেই জানাশোনা। গতকাল জানাল আমাকে তার বেশ ভালো লাগে। আমি রাজি থাকলে সে বিয়ে পর্যন্ত যেতে পারে।

তাই নাকি! আমি আর সুলতানা কোরাস কণ্ঠে আনন্দধ্বনি প্রকাশ করি, তা তোমার কেমন লেগেছে ?

কিছুক্ষণ চুপ থাকে নীলু। মাঝখানে ভয়ানক নীরবতা জমে। জট খুলে দেয় নীলুই, আমার ভালো না লাগলে এভাবে তোমাদের বলতাম ? কিন্তু এখন তো আর কচি বয়সে নেই। আরও কথাবার্তা হোক, আরেকটু বুঝি।

এ কি সেই নীলু, জহিরের ঘটনার পর বিয়ের প্রসঙ্গ এলেই বলত, জীবনে যে ধরা খেয়েছি, এরপর আর কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করি, সে সাহস আমার কীভাবে থাকে ?

সুলতানা আর নীলু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা নিয়ে কীসব বলতে থাকে, আমি সন্তর্পণে অতীতে ডুব দিই।

কুমিল্লায় যখন জহির এমন অভদ্র ব্যবহার করছিল তখন জহির আর তার এক বন্ধুর মাধ্যমে আমার মাথায় আসমান ভেঙে পড়ার মতো কথা বলে। জহির নাকি যেদিন থেকে আমাকে দেখেছে, সেদিন থেকে তার ভেতর সারাক্ষণ নাকি আমি ঘুরতে থাকি। তার মধ্যে জাদুর মতো কিছু একটা তৈরি হয়েছিল। কলেজ টাইমটায় সে অন্য এক শহরে পড়েছে। যে-কোনো কারণেই হোক, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। এ জন্য সে আমাদের আড্ডায় আসত না।

কিন্তু ভার্সিটিতে আমাকে লুকিয়ে দেখা থেকে সে নিজেকে সামলাতে পারে নি। যেহেতু স্কুল সময়ের প্রেম, নীলুর প্রতি তার আবেগ মরতে পারে নি। কিন্তু ক্রমে যখন নীলুর প্রতিও সব আবেগ নষ্ট হয়ে যেতে থাকল, আমি জিতুর প্রেমে বিভোর, সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিল না, এজন্য সে বদলি হয়ে কুমিল্লায় চলে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ যাওয়ার আগে আগেও সে নীলুকে জড়িয়ে ধরে অনেক ভালোবাসার কথা বলে গেছে। আমার নিজেকে যথারীতি তখন মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল।

অপ্রকৃতিস্থ নীলুর সামনে আমি কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াই ? আমার পরম বন্ধুকে হারানোর ভয়েও আমি তড়পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার প্রাণের সবচেয়ে গভীর তলায় নীলু চলে যায়, সে আমাকে মহাতাজ্জব করে আমাকেই তখন আঁকড়ে ধরেছিল। যত আমি বলি, সব দোষ আমার। আমি সবার জন্যই অভিশপ্ত। নিজের চেহারাকে আমি ঘৃণা করি।

নীলু থিতু হয়ে বলে, এখানে তুমি নিজেকে দোষ দিচ্ছ ? তুমি এগিয়ে গেছ তার দিকে ? এটা সে অন্যকোনো মেয়েকে নিয়েও করতে পারত।

কিরে মিলি, কই ডুবলি ?

কিচ্ছু না। একটু পাকোরা করে আনি ?

না না, তোকে উঠে যেতে হবে না। তুই বরং তোর ডিব্বায় থাকা তোর প্রিয় নিমকি আর চিপস বের করে এনে দে।

আমি সোজা ডিব্বাটা এনে বিছানায় রাখি। সুলতানা আর নীলু দেয়ালে হেলান দিয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসেছে। আমি প্লাস্টিকের চেয়ারে।

জানিস কাল রাস্তায় টাকলু রবিউলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছি।

কোন টাকলু ?

নীলু এত সহজে ভুলে গেলি ? ভার্সিটিতে থাকতে সারাক্ষণ আমার পেছন পেছন ঘুরত ?

ওহ ? ওই চুমুওয়ালা ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। বউ-বাচ্চা নিয়ে বান্দরবান বেড়াতে এসেছে। রিকশা খুঁজছিল। আমি হাই বলে সামনে এগিয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা বউয়ের আঁচলের তলায় ঢুকে গেল। এমন ভাব করল যেন আমাকে সে চেনে নি।

কী এক চুম্বক টানে আমরা ভার্সিটি লাইফে ফেরত যাই। আমি আর নীলু দশ ফুট বাই আট ফুটের একটা রুমে থাকতাম। স্টুডেন্টদের সব রুমই এমন। এর মধ্যে দুটো বিছানা, দুটো টেবিল-চেয়ার। পাশের রুমেই ছিল সুলতানা। সে-ই কায়দা করে একটা মেয়ের সঙ্গে বদলাবদলি করে আমাদের পাশের রুমটা নেয়। ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম দিন এখন যেমন রেগিং হয়, তখন ব্যাপারটা অত খারাপ ছিল না।

দলবেঁধে সামনে গিয়ে দেখি একঝাঁক নতুন লুঙ্গিপরা ছেলে সামনে এসে বলছে, আপা, কোনো সাহায্য লাগব ?

আমরা ভ্যাবাচ্যাকা বনে যাই। ভার্সিটিতে এরা কারা ?

ভদ্রভাবে বলি, না লাগবে না।

আহা আপনাদের স্বপ্নের তনু, লাগেজের ভারে ভাইঙ্গা যাইব।

আমরা ওদেরকে মাড়িয়ে গেলে, সুন্দরী গো দোহাই-দোহাই...।

সব তোর জন্য বলছে, আমাকে ইঙ্গিত করে গজগজায় সুলতানা।

অসম্ভব! ওরা সবাইকে উদ্দেশ করেই কথাগুলো বলছিল। সব জায়গায় আমাকে ফেলে দেওয়া ঠিক না।

পরে শুনেছি ওরা আমাদের ভার্সিটির সিনিয়র স্টুডেন্ট।

সুলতানা তোমার মনে আছে, তুমি আমাদের রুমে এসে গোপনে রাখা স্টোভটা বের করে দুদিকে দুপা ছড়িয়ে দিতে ?

ওই তো, ডিব্বা আর গোলাপ ?

আমি কিচ্ছুই জানি না।

অস্থিরভাবে বলি, আমি জানি না এমন কিছুও তখন ছিল তোমাদের মধ্যে।

এ অত বলার মতো কথা না। কিন্তু কোনো একটা স্মৃতি থেকে দূরে সরে গেলে তাকেই ব্যাপক লাগে। একটা নিঃশ্বাস টেনে নীলু বলে, সুলতানার সামনে মসলার ডিব্বা সাজানো ছিল, এদিকে আমি যে মস্ত এক কাঁটাওয়ালা গোলাপ গাছের সামনে পা ছড়িয়ে বসেছি, তা খেয়ালই ছিল না, বললাম, সুলতানা, পা ঠিক করো, নইলে ডিব্বাগুলো তো ভেতরে ঢুকে যাবে।

অপ্রস্তুত সুলতানা পা ঠিক করে আমার দিকে তাকায়, বলে, কাকে কী বলছিস তুই ? আগে নিজের পা ঠিক কর, নইলে টবসহ কাঁটাওয়ালা গোলাপ গাছ... হি হি হি। আমি হাসতে থাকি। মনে করতে গেলে এমন কত স্মৃতি।

লোডশেডিং হলে এক হলের ছাত্রদের আরেক হলের ছাত্ররা কী যে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে চিল্লাত। এত খারাপ ছিল ওগুলো! রুমে বসে আমরা কানে হাত দিতাম।

তিনজনই কুড়মুড় করে নিমকি চিপস খাই। থেকে থেকে মিতুলকে মনে পড়ছে। যদিও আজ সে অনেক নমনীয়, কিন্তু সে একা এক রুমে বসে আছে, আমরা হুজ্জোত করছি।

আমার চিন্তাকে ঘুরিয়ে দেয় সুলতানা, একরাতে শান্তনু কী করেছিল মনে আছে ?

থাকবে না আবার ? হি হি কঠিন শীতের রাত। সে কীভাবে যে গার্ডকে ম্যানেজ করে চাদর ঢাকা অবস্থায় প্রায় মাঝরাতে এসে হাজির। এসেই রীতিমতো কাঁদতে থাকে, কাঁদে না যত, চোখ-মুখে ভাব করে তার চেয়ে বেশি। সে কিছুই না বলে আমার কম্বলের নিচে ঢুকে যায়।

আমি-নীলু বিস্ময়ে ভয়ে কাঠ।

লেডিস হোস্টেলে পুরুষ ?

কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে সেই টেনশন সরে গিয়ে শান্তনুতে নিবদ্ধ হই। সে কাশতে কাশতে বলে ডাক্তার তাকে বলেছে, তার ব্রেন টিউমার হয়েছে। চিকিৎসা শুরুর আগে রেস্ট নিতে। আমি আত্মহত্যার আগে তোমাদের রুমে জীবনের শেষ ঘুম দিয়ে যাই।

দেহে হিমস্রোত বয়ে যায়।

কী বলছ শান্তনু ? এবার নীলু কাঁদতে থাকে।

শান্তনু বলল, আমার রুমে একটা ক্যাডার এসেছে। এত রাতে কই গিয়ে বিশ্রাম নিই ?

শান্তনু কম্বল মুড়ি দিয়ে দেয়ালমুখী হয়ে চুপ হয়ে যায়। নীলুর ছোট বেড নিয়ে আমরা আর কী করব ? দুজন একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাত পার করলাম। নীলু একটু পরপর ফুঁপিয়ে কাঁদে। আমার ধন্দ লাগে। শান্তনু যে মিচকি শয়তান, এ আমি ছোটবেলা থেকেই জানি নাটক করছে না তো ? নীলুও আজব, সবে এক বছর হয়েছে শান্তনু আর আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব, এতেই এত কাঁদছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন আজান পড়তেই আমি ধাক্কিয়ে শান্তনুকে বিছানা থেকে টেনে তুলি, বলি, তোমার অসুখ সম্পর্কে বিকেলে কথা হবে, এখন কাটো।

সত্যিই কী নাটক করতে পারে! নীলুরও স্মৃতি মনে হওয়ায় এখনো বিস্মিত। নিজের রুমে ক্যাডার ছিল তা ঠিক, কিন্তু এই ঠকঠকে শীতের রাতটা কীভাবে কাটাবে এটা ভেবে ব্রেন টিউমারের ভালোই নাটক করেছে। ও মা! কী অভিনয় করে চোখে পানি পর্যন্ত এনেছিল ?

আরে না না! সারা হাতে গ্লিসারিন লাগানো ছিল, এই জন্যই তো চোখে হাত লাগাচ্ছিল বারবার।

তারপরও ওর বিয়ের দুর্ঘটনার পর ও অনেকটা বদলে গেছে না ?

না তো, আমি বলি, বদলেছে বলে আমার মনে হয় না।

নীলু বলে, আমারও না।

কী জানি, আমারই বোঝার ভুল, সুলতানা বলে, কথা বললে মনে হয় বিষণ্ন হয়ে আছে।

এইবার আর পারি না।

এক ঝটকায় দাঁড়াই। উড়ন্ত পা ফেলে মেয়ের রুমে যাই। কোলবালিশ আঁকড়ে পরম প্রগাঢ়তায় ঘুমিয়ে আছে মিতুল।

তীব্র বন্যার পরের নদীর মতো।

ফিরে আসি।

কেমন দেখলে ?

ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই অবেলায় ?

সুলতানার এই প্রশ্নে নীলু বলে, ওর অনেক পজেটিভ বদল আসছে। আগে হলে এই আড্ডা ভণ্ডুল করার জন্য ভয়ানক কিছু করত। সেই মেয়ে ঘুমাচ্ছে।

এমনই যেন থাকে ও, ওপরে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে চোখ মেলে নিজ বুকে ফুঁ দিই।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, ওর সমস্ত আক্রোশ ক্ষোভের প্রকাশ সে তার মা'র ওপরই ঝাড়ে। তাকে বাইরে, ক্লাসে যারা অপমান করে, তা সে মুখ বুজে হজম করে, নীলু বলে, আজ ভয়ংকর বাজে একটা কাজ করেছি আমি, ওকে থাপ্পড় দিয়েছি। সে পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় আমাকে কিছুই বলল না। আমার সেই থেকে কী যে খারাপ লাগছে! আহারে ঘুমাচ্ছে, নইলে জড়িয়ে ধরে দশবার সরি বলতাম।

তুমি তখন তা না করলে আমার মনের যা অবস্থা হয়েছিল, সত্যি ন্যাড়া হয়ে যেতাম। তুমি ওকে থাপ্পড় দেওয়ায় আমি অনেকটা শান্ত হয়ে গেছিলাম।

থাক, ওকে আর সরি বলতে হবে না। এই একটু চাল-ডাল বসিয়ে দিই ? সেই হোস্টেল লাইফের মতো ? আমাদের সেই জাতীয় খাদ্য।

আমি বাড়িতে রান্না করেই এসেছি, সুলতানা বলে।

নীলু বলে, তুমি নিজের জন্য যা বেঁধেছ, তাই খেয়ে যাব। ডাল-ভাত হলেও সই।

আমি আমার জন্য কিচ্ছু রাঁধি নি।

বলিস কী ? সুলতানা অবাক, মেয়েকে নিয়ে হাওয়া খাওয়ার প্ল্যান।

খিচুড়িই বসানোর প্ল্যান, সঙ্গে ডিমভাজি, কতক্ষণ আর লাগবে ?

সমস্ত ঘরে একটা ঘোলাটে প্রচ্ছায়া চক্কর খেতে থাকে। সুলতানা উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়।

আঁধারে হাতি আর সার সার উটের মতো ঘনকালো পাহাড়গুলো। গলা চড়িয়ে বলি, আরও ঘন অরণ্যে চলে যাব, বৃক্ষ আমাকে ছায়া দেবে, মৃত্তিকা দেবে শয্যা।

সন্তর্পণে রান্নাঘরে চলে আসি আমি।

খিচুড়ি বসিয়ে গোল গোল করে বেগুন কাটতে থাকি ভেজে খাওয়ার জন্য।

আচমকা শুনি নীলু আর সুলতানা তর্ক লাগিয়েছে, টিভি ছেড়ে। একজন বলছে, আমি এই টাইমে স্টার প্লাসের একটা সিরিয়াল দেখি। অন্যজন বলে, আমি দেখি সনির ক্রাইম পেট্রল।

কিছুক্ষণ বাচ্চাদের মতো চেঁচামেচি করে দুজনে, এর মধ্যেই আমার রান্না হয়ে যায়। দুপুরের মাংস ছিল, তাই ট্রেতে সাজিয়ে যখন প্লেট আনতে যাব, গলা চড়ায় সুলতানা, আমাদের বাসার খাবারগুলোর কী হবে ?

ফ্রিজে রেখে দিয়ো।

১৫

এইভাবে দিনরাতগুলি যায়।

এর মধ্যে শান্তনু আসে।

সে এসে সুলতানার বাসায় ওঠে। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আমাদের বাসায় এলে কোথায় থাকত, এই নিয়ে আমার নিরন্তর খচখচানি গেছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে মিতুল অবুঝ আর গোঁয়ার। বলল, সে কথা দিয়েছিল, আমাদের বাসায় আসবে, ওই বাসায় উঠল কেন ? আমার সঙ্গে ও বিট্রে করেছে।

আমি বললাম, এখানে এলে ও কোথায় ঘুমুত ?

কেন, আমার ঘরে ? নিশ্চিন্ত উত্তর ওর। ও বিছানায় ঘুমুত আমি তোশক বিছিয়ে নিচে শুতাম, সিনেমায় দেখো না ?

তা মন্দ বলো নি, মনে মনে ভাবি। কিন্তু পরক্ষণেই খচখচ শুরু হয়, এই ব্যাপারটাও মোটেও শোভন দেখায় না। আমার টিনেজ মেয়ে। নীলু-সুলতানাকে কী বলতাম ? পৃথিবী উল্টোলেও মেয়ে তো আর আমার সঙ্গে শুতো না।

সন্ধ্যায় শান্তনু আমাদের বাড়ি এলে মিতুল দরজা আটকে বসে থাকে।

অনেক দিন পর ওকে দেখে আমার ভেতর পরম আপন প্রগাঢ়তার এক হিল্লোল বয়ে যায়। খুব বেশি বদলায় নি সে—না স্বভাবে না চেহারায়, আমার নাক টেনে বলে, তুই আর বদলাবি না, না ? তা আমাদের ম্যাডাম কই ? গোসসা করেছে ? দরজা ধাক্কাব না ভেঙে খুলে ঢুকব ?

তুমি বসো। একটু সময় দাও, ও একটু ধাতস্থ হোক।

পারফিউমের একটা মিহি মিষ্টি গন্ধ চারপাশে হালকা করে ছড়াতে থাকে। পাহাড়ি বাতাসের ঝাপটে মড়াও নড়ে ওঠে। ছুটে গিয়ে কষে ছিটকিনি আটকাই, বলি, তাগ্যিস বাতাসের পরে ঢুকেছ, নইলে যে পলকা দেহ তোমার, কোথায় যে উড়ে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোই হতো, হাঃ হাঃ হাসে শান্তনু, বাতাস থামলে তুই হারিকেন নিয়ে বনে বনে আমাকে খুঁজতি।

চারপাশে যেন পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝরে আত্মার বিলাপ। এমন আচমকা ঝড়টা শুরু হলো, আমি নিয়ে ঢুকেছি, ফের হাসে শান্তনু, এত ভয় পাচ্ছিস কেন? এদ্দিন এখানে আছিস, এখনো অভ্যাস হয় নি?

আমি অপর সোফায় গাঁট হয়ে বসি, মোটেই ভয় পাচ্ছি না। এদ্দিন পর এলে, আমরা কথা শুরুই করতে পারলাম না, কাণ্ডজ্ঞানহীন বাতাসটা বাগড়া মারল। কত কথা জমে আছে।

সত্যিই তোর অনেক কথা জমে আছে, আছে না এ কথার কথা? ফোন করলে তো কথাই খুঁজে পাস না।

আমাদের মধ্যে পুঞ্জীভূত প্রচ্ছায়া জমে।

আমি আসলে ফোনে পারি না, মানে কারও মুখ না দেখে তার সঙ্গে জমিয়ে কথা বলতে পারি না। বলে ফিসফিস করি, মিতুলকে ডাকো। তাকে পাত্তা না দিয়ে আড্ডা মারছি, পরে সামলানো যাবে না।

মনে হচ্ছিল অঝোরে বৃষ্টি হবে।

কিন্তু বাতাস কয়েকটা বড় ধাক্কা দিয়েই স্তিমিত হতে থাকে।

শান্তনু মিতুলের দরজায় নক করে।

নিরুত্তর।

মিতুল, উঁচু গলায় ডাকে।

নিরুত্তর।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ মেরে শান্তনু ছেলেমানুষি স্বভাবে মিতুলের দরজায় এলোপাথাড়ি কিল মারতে থাকে। এতেও কাজ না হলে উচ্চকণ্ঠে শান্তনু বলে, আজ তাহলে আমি চলে গেলাম, বলে আমাকে বলে, আমি কাল আবার আসব।

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই।

সত্যিই তুমি ওর ওপর রাগ করে আজ চলে যাচ্ছ?

আরে না, না, আজ সুলতানার ওখানে আমার একটা জরুরি কাজ আছে। আজ এমনিই জাস্ট দেখা করতে এসেছিলাম।

আমি রাগ-ঘৃণা ক্ষোভ এসব ভুলে গেছি সেই কবে! কিন্তু শান্তনুর কথায় কোন সেই মহা অতল গহ্বর থেকে কঠিন ক্ষোভ ধীরলয়ে ওপর দিকে আসতে আসতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেয়। না, এ ক্ষোভ নয়, অভিমান। আমার মধ্যেও অভিমান আছে?

তাহলে ঢাকায় থাকতে কেন বলেছিলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছ?

পরে সব বুঝিয়ে বলব, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে মিতুল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তনুর ওপর, খুব চলে যাওয়া হচ্ছে? আমি যেতে দিলে তো!

এই তো পেয়ে গেছি, মিতুলের হাত ধরে ওর ঘরের দিকে যেতে যেতে শান্তনু বলে, চলো, তোমার রুমে বসে জম্পেশ আড্ডা দিই।

আমি অবাক কণ্ঠে বলি, তোমার না কি জরুরি কাজ আছে?

কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে আমার কানের কাছে ফিসফিস করে শান্তনু, আমি তোমার প্রতিক্রিয়া দেখতে চাইছিলাম। দেখা হয়ে গেছে।

আমার পা থেকে মাথা অব্দি লজ্জার দুর্মর এক শিহরন বয়ে যায়। আমার অস্তিত্ব থেকে হারিয়ে যাওয়া অভিমান দেখে ফেলেছে শান্তনু। এ মারাত্মক খারাপ হলো। এই বোধ ছিল আমার তাৎক্ষণিক। এটাকে চিরায়ত ভেবে নিয়ে শান্তনু নিশ্চিন্তে আমাকে নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইবে। নীলু-সুলতানার চাপে পড়ে সে আমার সঙ্গে বাকি জীবনটা কাটাতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছে।

আমি এইসবের জন্য মোটেই প্রস্তুত না, প্রস্তুত হতে আদৌ এই জীবনে পারব কি না জানি না। নীলু-সুলতানা বলে, দেখবি, সহজাত প্রবণতায় মিতুল বড়সড় একটা নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ক্রমে থিতিয়ে আসবে।

আমার মনে হয় আসমান থেকে বাজ টেনে মাটিতে ফেলবে মিতুল।

পরক্ষণেই ওদের কথার ওপরও ভরসা আসে খানিকটা। আমি যদি অন্য কাউকে বিয়ে করতাম, মিতুলকে তার পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। শান্তনু হলে মিতুলের জন্য জীবনটা অনায়াস হবে।

ভাবতে ভাবতেই তাজ্জব হই, অন্য একটা ছেলেকে বিয়ের প্রশ্ন আসছে কেন? যে কাউকেই বিয়ের প্রশ্ন আসছে আচমকা কেন? আমি তো জীবনের শূন্যতাই বহু বছর মেনে জীবনসঙ্গীর কথা কল্পনা পর্যন্ত করি নি।

কল্পনা করলেই প্রেতদের স্তব্ধ উল্লাসের মতো এগিয়ে এসেছে আমাকে কামড়ে ছিবড়ে মন্টুর ভেতরে প্রবেশ করার স্মৃতি। ভয়ে রি রি করে উঠেছে শরীর।

ওই যৌনপথ দিয়ে এই জীবনে আর কারও লিঙ্গ প্রবেশ করবে, এ আমার কল্পনার বাইরে। ওই ছেঁড়াখোঁড়া পথেও ডাক্তারের অনেক সেলাই আছে।

সুলতানা আমাকে বলেছে, এটা তোমার ট্রমা। একটা সুস্থ শারীরিক সম্পর্ক তোমাকে এই ভয় থেকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। অপার্থিব সেই অভিজ্ঞতা। তুমি একজন কাউন্সিলরের সঙ্গে কথা বলো।

মানুষের জোর দিয়ে বলা কথা অন্য মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আমার জীবনের শূন্যতা, অর্থহীনতা তক্কে তক্কে দেখিয়ে জীবনসঙ্গী সম্পর্কে ভাবতে বলে সুলতানা-নীলুরা।

মাঝে মাঝে তাই এই সম্পর্কে পজেটিভ ভাবনা আসে। ও ঘরে শান্তনু আর মিতুলের উচ্চ হাসির শব্দ ভেসে আসছে। শৈশবের পর মিতুলকে এইভাবে হাসতে শুনি নি। মনটা ভালো হয়ে যায়।

পরক্ষণেই শীতের উত্তুরে হাওয়ার মতো একটা বোধ এসে আমার আত্মার শূন্যতা ব্যাপক করে তোলে।

এই যে মিতুল উচ্চস্বরে হাসছে, উচ্চস্বরে না হোক, আমার সান্নিধ্যে মিতুল যদি একটু হাসত মাঝেমধ্যে তাতেও আমার নিঃসঙ্গতা অনেক ঘুচে যেত।

মানুষ একটা সন্তান নিয়েও জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। সেই সন্তানই আমার কাছে, কিন্তু এই থাকা আমার প্রাণকে এমন মর্মঘাতী আঘাতে বিক্ষত করে, মাঝে মাঝেই মনে হয় ও না থাকলে আমার জীবনটা তাও আনন্দের হতে পারত।

ওকে নিয়ে একটা পাহাড়ি এলাকায় ঘাপটি মারার চাইতে এমএ-টা দিয়ে আমার যেদিকে দুচোখ যায় যেতে পারতাম। যেভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে বাঁচতে পারতাম। জলে চোখ ভরে ওঠে।

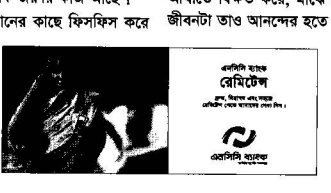

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬

শান্তনু চলে গেলে সব গুছিয়ে বিছানায় শুয়ে মৎস্য চক্ষু খুলে রাখি। মিতুল শান্তনুর হাত আঁকড়েই এ ঘরে এসেছিল। সোফায় দুজন পাশাপাশি বসলে অপরপাশে বসে আমি কথা হারিয়ে ফেলি। জীবনের প্রথম মিতুল আমার ঘরের সোফায় বসল। ব্যাপারটা এত অস্বস্তিকর ছিল, সহজ হতে আমি বলি, আমি বরং নাস্তাটা নিয়ে আসি। রাতে খেয়ে না গেলে সুলতানার ওখানেই থেকো, আমাদের এখানে আর আসতে হবে না।

তাহলে এখন কিছু খাব না, বলে মিতুলের দিকে তাকায় শান্তনু, তোমার সঙ্গে তো অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম, এখন তোমার মা'র সঙ্গে একটু বসি ?

কেন আমি এখানে বসলে তোমাদের প্রবলেম আছে ?

আমি হকচকিয়ে যাই। কিছু কিছু ব্যাপারে মেয়েটা এত কমনসেন্সহীন যে আমি কথা বলার ভাষা খুঁজে পাই না।

এটা কোনো পরিণত মানুষের কথা হলো ? শান্তনু কটাক্ষ করে। প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের আলাদা কিছু কথা বলার থাকে;'সামনে এসএসসি দিচ্ছ, এইটুকু বোঝার বয়স তোমার হয় নি ?

আলাদা কথা কি ? বলে মিচকি মিচকি হাসে, তুমি মায়ের জন্য ছেলে দেখছ, ঘটকালি করছ, এ তো আমি জানিই, এরচেয়ে গোপন কথা আর কী হতে পারে।

ভূমণ্ডল নড়ে ওঠে। শান্তনু নিজের কোটরের ভাঁজে এ-কী ভয়ানক কথা লুকিয়ে রেখেছে যা আমাকে না বলে মিতুলকে বলেছে ? আর মিতুলই এমন একটা ভয়ংকর কথা হেসে হেসে কীভাবে বলছে!

শান্তনু একেবারে কেঁচো হয়ে যায়।

আমি ঝাঁজিয়ে উঠি, মিতুল, এ কথা তোমাকে শান্তনু বলেছে ? কেন ? কবে ?

ভেংচির ভান করে মিতুল গলা উচ্চকিত করে, কেন তোমাকে কিছু বলে নি, নাকি আমার সামনে ভান করছ ?

শান্তনু এসব কী শুনছি, মিতুলের সঙ্গে ফাজলামোর মাত্রাটা তুমি এই পর্যন্ত এনেছ ?

বিশ্বাস করো, কথাগুলি এইভাবে হয় নি। আমি মিতুলকে সব রকম পরিস্থিতি যাতে মানিয়ে নিতে শিখে, তোমার ব্যাপারটায় যেন সে ছাড় দিতে পারে, সে জন্য মানসিকভাবে ওকে তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম।

আমার আত্মা ঝাঁ ঝাঁ করে জ্বলে ওঠে। তার জন্য এই শিক্ষার কী দরকার ছিল ? আমি কি তোমাকে আমার বিয়ের কথা বলেছিলাম ?

শান্তনুকে বোবা হতে দেখে এইবার মিতুল অপ্রস্তুত বোধ করে। বলে, তুমি নাইবা বলো, তোমার কাজিন হিসেবে সে ব্যাপারটা ভেবেছে। আমিও বলেছি, আমার বিয়ে হয়ে গেলে মা যাকে খুশি বিয়ে করুক, আমার প্রবলেম নাই।

'আমার বিয়ে হয়ে গেলে' আমার করোটিতে ঝাঁক ঝাঁক ছায়া ঢুকে যায়। যে মিতুল আজীবন বলে এসেছে, তার মতো মেয়েকে যেহেতু কোনোদিন কেউ বিয়ে করবে না, এইচএসসি সেরে সে বিদেশ চলে যাবে। এমনও বলেছে, গেলে সে আফ্রিকায় যাবে, সেখানে গেলে তার রূপ নিয়ে কেউ টিজ করতে পারবে না।

অবাক শান্তনুও কম হয় নি, তোমার বিয়ে মানে ? তুমি বিয়ের কথা কবে থেকে ভাবছ ?

ভাবছি ভাবছি। রহস্য করে মিতুল পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে উঠে যায়।

সবেগে দাঁড়ায় শান্তনু, আই অ্যাম সরি মিলি। ব্যাপারটা যে এত বাজেভাবে উপস্থাপিত হবে, আমি কল্পনা করি নি। আমি যাচ্ছি।

আমি সমস্ত ঘটনায় এত হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছিলাম, শান্তনুকে যে এভাবে যেতে দেওয়া উচিত না, তা আমার বোধের মধ্যেই থাকে না।

ধীরে ধীরে থিতু হলে দুর্দান্ত অনুশোচনায় আমি নিথর হয়ে পড়ি। মিতুলের সঙ্গে শান্তনুর মামাভাগ্নির সম্পর্ক না। বন্ধুত্বের। মিতুলের নানারকম টানাপোড়েন তাকে ধাতস্থ করতে নানারকম কাউন্সিলিং করতে নানা কৌশলের আশ্রয় নেয় শান্তনু।

আমি বলতে গেলে জনমভর ভরে শান্তনুকে চিনি। আমার সংসার ভাঙার পর নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনের পর দিন আমাকে সামলেছে শান্তনু।

মিতুলের দায়িত্বও সে আমারে দিকে তাকিয়ে নিয়েছিল। ব্যাকরণহীন মিতুলের কথায় তার সঙ্গে আমার এক কণাও তিক্ত ব্যবহার করা ঠিক হয় নি।

যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বারবার ভাবি, একটা ফোন দিই শান্তনুকে।

কিন্তু মনে হয় ও আমার ফোনটা ধরবে না। যদি না ধরে, আমি আরও বেশি মুষড়ে পড়ব।

আমি তাকে রাতে আমার বাড়িতে খেতে জোর দিয়েছিলাম। রাতের খাবার তো দূরের কথা, এক কাপ চা পর্যন্ত না খেয়ে সে বেরিয়ে গেল, আমি তাকে আটকালাম না ? আমার চোখ ফের জলে ভরে ওঠে।

আমি কি শান্তনুকে হারিয়ে ফেললাম ?

তখনই আমাকে সুখের সমুদ্রে ভাসিয়ে শান্তনুই আমাকে ফোন করে, কিরে কাঁদছিস ?

আমাকে এত বোঝে শান্তনু, ভেতর ঠেলে ওঠা ভালো লাগার কান্না সামলে বলি, আমি সরি শান্তনু। যাওয়ার সময় তুমি সরি হয়েছিলে। তোমার ভুল ছিল না। আমিই তো আমার মেয়েকে চিনি না। কখন সে কী করবে, কোনটাকে কীভাবে নেবে সেইভাবে জানি না, তার কথায় তোমার সঙ্গে...।

আমার সঙ্গে কী করেছ তুমি ? তখনকার পরিস্থিতিতে যার যা করার কথা তা করেছে। কিন্তু আমি এটা নিয়ে ভাবছি না। আমি ভাবছি তোমার সামনে নিজের বিয়ের কথা বলল সে কোন ভরসায় ? শুধু আমাকে যদি আলাদা বলত আমি সিরিয়াসলি নিতাম না। এমন অনেক পরিস্থিতি আমি সামলাই। ওর সঙ্গে কি সম্প্রতি কারও সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ?

আমি শোয়া থেকে উঠে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানায় পা ছড়িয়ে বসি।

ঘরের চারপাশে পুঞ্জীভূত ছায়ার নহর। আমার চোখের সামনে গাঢ় আঁধারের স্তব্ধ উল্লাস।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলি, না শান্তনু, ওর জীবনে কেউ এলে তুমি অবশ্যই জানতে, তোমাকে লুকোতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। আমার মনে হয় কথাটা সাধারণভাবে বলেছে, মানুষ বলে না, আগে আমার বিয়ে হোক, পরে—ওইরকমই।

হুম! তাই হয়তো, ইথারে ইথারে শান্তনুর কণ্ঠ কম্পমান, তবে কী, মানুষটা মিতুল বলেই এ নিয়ে এত চিন্তা হচ্ছে। যে পোড়খাওয়া মেয়ে ও, আর দশটা মেয়ের মতো নিজের বিয়ের কথাটা অনায়াসে বলাটা তার জন্য অবিশ্বাস্য। বাদ দাও, একটা বিষয় নিয়ে এত ক্যাচাল ভালো লাগছে না।

তুমি কদিন থাকবে ?

একটু থেমে ধীরলয়ে জিজ্ঞেস করি।

তুমি কদিন চাও ?

আহা আমার জানুরে... আমি হাসতে থাকি, তুমি সুলতানার গেস্ট, এ কথা তুমি সুলতানাকে বলতে পারো।

সুলতানা তো আমাকে জিজ্ঞেস করে নি।

উফ! এত তর্ক করলে আমার ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে গাছ উঠবে।

কী যে একটা কথা বললে না, পারম্পর্যহীন।

এরপর ফের খানিক স্তব্ধতা।

আমাদের রিসিভারে গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশা জমতে থাকে। আলোর তির্যক বাণে তা সরিয়ে শান্তনু বলে, আগামীকাল রাতে আমি আসা উপলক্ষে নীলু, মিতুল আর তোমাকে ইনভাইট করবে।

এর আবার কী দরকার ছিল ?

সে তুমি সুলতানাকেই বলো। একটু কেশে শান্তনু বলে, তোমার সঙ্গে আমায় ফর্মাল কোনো সম্পর্ক না। আমরা যেন আবার ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে না পড়ি তার জন্য আগেভাগেই একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে রাখি, তোমার আর আমার একটা স্থায়ী সম্পর্কের ব্যাপারে নীলু আর সুলতানা যেমন আমাকে প্রচুর বুঝিয়েছে, আমার মনে হয় তোমাকেও তা করেছে।

আমি চুপ হয়ে যাই।

কাল আড্ডায় এই প্রসঙ্গটা যে-কোনোভাবে আসার আগে তোমার সঙ্গে আমার একান্তে কথা বলা ভীষণ প্রয়োজন।

এমন কিছু হতে পারে না, আমি নিঃশ্বাস টেনে বলি, কথা বলে কী হবে।

হোক না হোক, কথাটা জরুরি মিলি। আমরা এক কাজ করি, রাতে সুলতানার বাড়িতে যাওয়ার আগে আমরা বাইরে কোথাও একটু বসি। ডিনারের দাওয়াত, একটু দেরি করে গেলেও প্রবলেম হবে না ?

একটু ভেবে বলি, ঠিক আছে।

১৭

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে যায় মিহি এক কান্নার শব্দে। ধীরে ধীরে মাথা উঠিয়ে কান খাড়া করি। মিতুলের ঘর থেকে কান্নাটা আসছে। আমার বুক ধড়াস করে ওঠে। হাজারো প্রতিকূল পরিবেশেও এ জীবনে এমন কাঁদতে শুনি নি। আড়মোড়ার গুষ্ঠি কিলিয়ে আমি তিন লাফে ওর ঘরে যাই। হাঁটুতে মুখ গুঁজে মেঝেতে বসে শব্দ করে কাঁদছে মিতুল।

আমি সজোরে এগিয়ে যাই, কী হয়েছে সোনা ? এমন কাঁদছ কেন ?

আমাকে হতভম্ব করে মিতুল আমাকে জড়িয়ে ধরে আরও জোরে কেঁদে ওঠে, মা কালকের পর থেকে আমি ফ্রেন্ড শান্তনুর শত্রু হয়ে গেছি।

সে আমার ফোন ধরে না। প্রায়ই কেটে দেয়। জীবনে সে আমার সঙ্গে এমন করে নি।

তাই বুঝি ? কিন্তু এরজন্য তুমি মাঝরাতে কাঁদছ কেন ?

মিতুল থমকে যায়। বলে, কষ্টে অপমানে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল তখন থেকেই। আজ সারা রাত ছটফট করতে করতে ধৈর্যহারা হয়ে আমি কিছুক্ষণ আগে ফোন করে ফেলি। অনেকক্ষণ রিং বাজার পর সে ধরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, এত রাতে কেউ কাউকে ফোন করে ? তোমার জীবনেও যেহেতু কমনসেন্স হবে না তো আমাকে ফোন দিয়ে বিরক্ত কোরো না।

এভাবে বলেছে শান্তনু ? আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই। যে কারণে শান্তনু মিতুলের ওপর বিরক্ত সেটা তো আমার সঙ্গে দীর্ঘ কথায় মিটেই গেছে। তার মানে মিতুলের কথাতেই যেহেতু আমি রিঅ্যাক্ট করেছিলাম, আমার ওপর সেজন্য শান্তনুর রাগটা নেই। কিন্তু মিতুলকে সে ক্ষমা করতে পারে নি।

মা, তুমি ব্যাপারটা মিটিয়ে দাও, চোখ মুছতে মুছতে মিতুল বলে, যেহেতু ও তোমার কাজিন, তোমার কথা শুনবে।

'কাজিন' শব্দটা এমন জোর দিয়ে মিতুল সব সময় বলে, আমার অস্বস্তি লাগে। আমরা শৈশব থেকে বন্ধুর মতোই বড় হয়েছি। আত্মীয়স্বজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈশবে যখন আমাদের বিয়ের কথা বলত, আমরা দুজন ব্যাপারটা মেনে নিয়েই লজ্জা পেতাম।

বড় হতে হতে ব্যাপারটা আমাদের মধ্য থেকে চলে গেছে। আমি জিতুর প্রেমে পড়েছি। কিন্তু আমরা তারপরও কখনো মামাতো ভাইবোনের মতো মিশতাম না। শান্তনুর দিক থেকে আমার প্রতি কেয়ার বন্ধুর চেয়ে একটু বেশি থাকলেও, সেও একসময় বিয়ে করেছিল।

আমি মিতুলের মাথায় হালকা থাপ্পড় দিতে দিতে বলি, বলব।

১৮

চাঁদ সরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। বুনো ঘ্রাণে আকুল আকুল লাগে সর্বসত্তা। আমার হাত ধরে টিলাপাহাড়ের ওপর উঠছে শান্তনু। কিছুক্ষণ পরপরই আমার হাঁপ ধরে যাচ্ছে। আশপাশের কিছুটা বড় পাহাড়ে মানুষের হুজ্জোত। ওরা গাড়ি দিয়ে উঠেছে।

আর কদ্দূর ?

এই তো। আজ জ্যোৎস্নাটাকে একটু নির্জনে উপভোগ করবে না ?

হুম! একসময় ওপরে উঠে কায়দামতো বসার চেষ্টা করলাম।

চারপাশে আলো-আঁধারের বিচ্ছুরণ। কতগুলো বাতিহীন পাহাড়কে হাতির মতো লাগছে।

জয়তী পাহাড় খুব ভালোবাসত, আচমকা বলে উঠে শান্তনু।

একটু হড়কে গিয়ে হেসে উঠি, ও তোমার বউ, এসেছিলে একসঙ্গে ?

না। প্ল্যান হয়েছিল, এরপরই সব শেষ হয়ে গেল। বুনোবাতাসের ঝাপটা ভেতরটাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, বলি, তোমাদের ব্যাপারটা আমি পরিষ্কারভাবে কিছুই জানি না। ও কি কারও সঙ্গে চলে গেছিল ?

আজ থাক। ওর প্রসঙ্গ এনে মুড অফ করার কোনো মানে হয় না।

আমরা কি নতুন প্রেমিক-প্রেমিকা ? হেসে বলি, পুরোনো জনের কথা শুনে মুড অফ হবে ? প্লিজ শর্টকার্ট বলো কী হয়েছিল।

ভালো লাগার বিয়ে হয়েছিল জানোই তো, ভালোবাসা হয়ে ওঠে নি। দুজনই বলতাম, বিয়ের পর প্রেম করব।

কিন্তু বিয়ের পর প্রায়ই সে অন্যমনস্ক থাকত। আমি তদ্দিনে ওকে ভালোবাসে ফেলেছি। আমার প্রতি সাংঘাতিক কেয়ারিং থাকার চেষ্টা করত।

এক মাসের মাথায় পাহাড়ে যাওয়ার প্ল্যান করছি। আচমকা সে হাওয়া। চিঠি পেলাম, লিখেছে তার দীর্ঘদিনের প্রেমিক তার সঙ্গে বিট্টে করেছিল, তাকে শিক্ষা দিতে আমাকে বিয়ে করেছিল। এখন জেনেছে বিট্টে করার ব্যাপারটি পুরোটাই ভুল বুঝাবুঝি ছিল। সে ডিভোর্স লেটার দিয়ে গেছে, আমিও যেন দিয়ে দিই।

জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো ধাক্কা খেলাম।

প্রথম ধাক্কাটা কে দিয়েছিল ?

আহা, জানো না যেন, জিতুর কাছে যখন চলে গেলে—।

আমি হই হই করে উঠি, তুমি কষ্ট পেয়েছিলে ? আশ্চর্য! অথচ ওকে আমাকে নিয়ে কত মজা করতে তুমি, সত্যিই পুরুষেরা বড় রহস্যময়।

হাঃ হাঃ হাঃ তবে জানো কী মিলি, কোনো হাসব্যান্ডকে তার স্ত্রী ফেলে চলে গেলে আত্মার চেয়ে ইগোতে লাগে বেশি। আমার কোথাও বেরুতে এত অস্বস্তি হতো। কেউ মুখে সান্ত্বনা দিত। কেউ চোখে। একেবারে কুঁকড়ে যেতাম আমি। জয়তীকে মিস করে মাঝে মাঝে কেঁদেছিও। হাঃ হাঃ হাঃ...।

আমি যেন নতুন শান্তনুকে দেখছি, বলে খোঁচা দিই, আমার জন্য কাঁদ নি ?

বাদ দাও এসব প্রসঙ্গ—বলে তুড়ি মারে শূন্যে শান্তনু, এবার অতীত থাক, বর্তমান ভবিষ্যতে এসে একটু বসি ?

আমি মহা অস্বস্তিতে পড়ে যাই। সুলতানা-নীলুর প্রসঙ্গগুলো উঠবে।

বলি, যেভাবে চলছে চলুক না, এটা কি সেমিনার নাকি, বিভাগ ভাগ করে কথা বলতে হবে ?

পাহাড়ের আলো-বাতাসে ধীরে ধীরে মগজের কোষ খুলতে থাকে।

তুই আমাকে বিয়ে করবি ?

চমকে উঠি। জানি জড়তা কাটাতেই তুই করে বলল, এমন একটা বিষয় নিয়ে।

আমি চুপ করে থাকি।

আমার তাড়া নেই। তুমি যখন মনে করবে...।

আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। কেন বিয়ে করব ? কে কাকে বিয়ে করবে ? আমি তো আমার অস্তিত্ব ভুলেই গেছি কতকাল ধরে! এই বিয়ে করে কার সুখ কার দুঃখ...কথাগুলি বলি শান্তনুকে অসংলগ্নভাবে।

হু হু বাতাস বইছে।

প্রকাশিত চন্দ্রের নহর চারপাশটায় থই থই নিঃশব্দে ঢাক পেটাচ্ছে। আমরা দুজন জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বিষণ্ন হয়ে উঠি।

আমারও এমন মনে হতো। নিজেকে নিয়ে, একটু কেশে বলে শান্তনু। কে আমি, কী আমি, কেন বেঁচে আছি ? এর মধ্যে সুলতানা-নীলু এমন ঘা দিতে থাকল, ঠিক ঘা না, উস্কাতে থাকল, বলল, দুইজন অর্ধমৃত মানুষ একজন আরেকজনকে জড়িয়ে থেকে দেখ না, জীবন তো একটাই।

তুমি তাদের প্রভাবে আমাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিলে ?

না, পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে অনেক কষ্টে জ্বালানোর চেষ্টা করে শান্তনু, বাতাসের জন্য পারে না।

নতুন খাওয়া ধরেছ দেখছি, আনাড়িপনা বোঝাই যাচ্ছে।

আমার কথা ঘুরিয়ে আমাকে চমকে দিয়ে দুহাত দিয়ে আমার মুখটা ধরে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে শান্তনু, স্পষ্ট করে একটা সত্য বলি, এবার এখানে এসে তোমাকে দেখে হু হু করে অতীতে চলে গেছি আমি। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমার অতীতের মিলি, বদল কেবল তখন সজ্জিতা ছিলে, এখন সাদামাটা হয়ে যেন ফুরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করছ। আমি তোমাকে ফুরাতে দেব না। আমার জীবনের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে হবেই।

নীলুরা আমাকেও কম প্রভাবিত করে নি, ফলে তর্কে না গিয়ে মিতুলের কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুল দেশের বাইরে গেলেই।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

বাতাসের সঙ্গে চাঁদের নহর ঘুরতে ঘুরতে শান্তনু ঝাঁকড়া চুল উড়াতে থাকে। বড় সুন্দর দেখায় তাকে। বলি, তুমি মিতুলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ কেন ? তোমাকে এই ছেলেমানুষি মানায় না।

তুমি বুঝছ না মিলি, এই মিতুলকে আমি চিনি না। আগেও অনেকটা এমন ছিল, কিন্তু এখন সে যেন তোমার সঙ্গে মরিয়া হয়ে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আমার ওকে নিয়ে ভয় হচ্ছে।

ও এমনই। এ নতুন কিছু না। ওর জীবনে তুমি ব্যাপক একটা কিছু। কাঁদতে কাঁদতে বেচারি পাগলের মতো হয়ে গেছে। আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না, তুমি এক্ষণি তাকে একটা ফোন দাও।

এক্ষণ ? বিব্রত বোধ করে শান্তনু, প্রত্যেকটা কথার একটা আবহ থাকতে হয়। আমি পাহাড়ের ওপর বসে তোমার সঙ্গে একটা নাজুক বিষয়ে কথা বলছি, এখন নিজেকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে ওর সঙ্গে কী কথা বলব ? এর মধ্যে ও আমাকে নিয়ে আপসেট হয়ে আছে।

চুপ করে থাকি।

তুমি আমার প্রস্তাব নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে পড়ো না, কিছুটা থেমে শান্তনু ফের আগের প্রসঙ্গে যায়। নীলু, সুলতানা যাই বলুক, আমরা তো বাচ্চা না, ওদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তুমি যদি বিয়ে না করতে চাও, আমার দিক থেকে সম্পর্ক আগের মতোই থাকবে। তা ছাড়া সবে এসএসসি দিচ্ছে মিতুল, এইচএসসির পর দেশের বাইরে যাবে, ম্যালা সময় আছে এ নিয়ে ভাবার।

এভাবে বোঝাচ্ছ কেন ? মাথা চিৎ করে চাঁদের দিকে তাকাই, আমি অস্বস্তি বোধ করছি তোমাকে বলেছি ?

যতই কাছে দূরে হোক মিতুলের যাওয়ার, আমরা দুজন যে-কোনো একটা সম্পর্কে স্থির হলে আমাদের খুড়িয়ে চলা জীবনটা পাল্টাবে। আমরা স্রেফ আগের মতো বন্ধু থাকলে আমরা আগের মতোই চলব। বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে, তা যত দূরেই হোক, আমরা পাল্টাতে বাধ্য হব। তা ছাড়া, থেমে দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ কাটি, আমরা তো অনেকদূর মেনেই নিয়েছি, মিতুল চলে গেলে আমরা...এ নিয়ে আর কথা থাক।

রিংয়ের শব্দে চমকে উঠি।

জীবনে যা ঘটে না, মিতুলের ফোন। হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকি এই বোকা ভাবনায়, ফোন ধরলে যেন মিতুল দেখে ফেলবে আমরা কারা কোথায় আছি।

মা তুমি কোথায় ?

কানের কাছে রিসিভার কাঁপতে থাকে। আমি মিথ্যে তেমন বলতে পারি না। বহু কষ্টে নিজেকে বিন্যস্ত করে জিজ্ঞেস করি, কেন ?

তোমার স্কুল ছুটি হয়েছে তো অনেকক্ষণ।

আমি সুলতানার বাসায়।

ফ্রেন্ড শান্তনু ওখানে আছে ?

ও এখনো এসে পৌঁছায় নি।

তুমি তাকে আমার কথা বলো নি ?

বলেছি। সে কাল তোমার কাছে যাবে।

এদিকে নীলু খালাও বলল সুলতানা আন্টির বাড়ি যাচ্ছে, তোমাদের সবার দাওয়াত ?

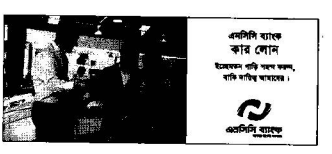

হ্যাঁ।

আমি নীলুর খালার সঙ্গে চলে আসি ? ফ্রেন্ড শান্তনুর পা ছুঁয়ে মাফ চাইব।

তার দরকার নেই। রাতে সে তোমাকে ফোন দেবে।

মিতুলের গলায় কান্না হেচকি দিয়ে ওঠে। আগে কত বলতে আমি অসামাজিক। কারও বাড়ি যাই না। আজ নিজ থেকে যেতে চাইছি, তুমি বাধা দিচ্ছ।

কিছুক্ষণ থেমে বলি, ঠিক আছে, আমি নীলুকে বলছি। ফোন রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি।

কী হয়েছে ? শান্তনুর নিঃশ্বাসের বাতাস উড়ে উড়ে আসে। ও মিতুলের সঙ্গে সুলতানার বাসায় আসতে চাইছে। আর তুমি হ্যাঁ করে দিয়েছ ?

কী আর করব ?

কী জানি আমরা কোন প্রসঙ্গে কথা বলি, কথা কোন দিকে মোড় নেয়, আরেকটা বড় কোনো সিন ক্রিয়েট না হয়ে যায়।

আমাদের বিয়ের ব্যাপার তো ? সে নিয়ে তো কথা হয়েই গেছে। গিয়েই জানিয়ে দেব। ওই প্রসঙ্গে আর কথা না তুললেই হবে।

ও আমাদের মাঝখানে বসে থাকবে, সেদিনের মতো ?

নীলুর ফোন আসে। বুকটা হিম হয়ে যায়। রিসিভার কানে নিয়ে যা ভেবেছিলাম, তোমার মেয়েকে তুমি এসে নিয়ে যাও, আমি যাচ্ছি না।

পাশে মিতুলের ঘ্যান ঘ্যান শোনা যায়, আমি রঙতুলি নিয়ে যাব। অন্য ঘরে বসে ছবি আঁকব। তোমাদের বিরক্ত করব না।

শুনলে তো ? আমি কাতর কণ্ঠে নীলুকে বলি, ও কোনোদিন এভাবে আমাকে বলে না। আমি না করতে পারি নি।

সুলতানাকে সামলিও—নীলুর গলায় ঝাঁজ।

নীলু আমরা একসঙ্গে এখনো আছি। যে বিষয় নিয়ে তোমরা কথা বলতে চাইছিলে সে বিষয়ে আমরা একটা ভাবনায় পৌঁছেছি।

ভাবনায় পৌঁছানো মানে ? ইয়েস না নো ?

সামনাসামনি বলব।

তোমার আজগুবি কন্যার সামনে ?

এই নীলু, আমার আত্মা কেঁপে ওঠে, তোমার পাশে মিতুল না ?

না। ও চলে গেছে।

চলে গেছে মানে ? রাগ করে ?

না, ও রঙতুলি বলায় আমি ওকে ইশারায় জানিয়েছি, নিয়ে যাব।

থ্যাংকস নীলু। আসলে ব্যাপারটা দু-আড়াই বছর পরের। এক্ষণি তো আর কাবিন করতে বলছি না। আমি ভেবেছি শান্তনু আসা উপলক্ষে সুলতানা আমাদের ইনভাইট করেছে। তোমরা যদি আমার বিয়ে পাকা করতে এই আয়োজন করে থাকো, তবে আমি যাব না।

এইবার নীলু অস্বস্তিতে পড়ে, আরে না না, মানে আমরা একসঙ্গে যে আড্ডাই দিই, এই প্রসঙ্গটা আসবে না, তা কি গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় ?

ধীরে ধীরে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি আমাদের ঘিরে ফেলতে থাকে। আমি শৈশবে ফিরে যাই। কী নিষ্ঠুর ছিলাম, জোনাকি ধরে ধরে শোকেসে ভরে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতবার যে ছুটে ছুটে ওদেরকে ধরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়েও দিয়েছি। ফোনটা শান্তনুর হাতে দিয়ে নিজ অজান্তেই আড়মোড়া ভেঙে দাঁড়িয়ে যাই। নিজের অস্তিত্ব ভুলে শৈশবের মতোই জোনাকি ধরতে শুরু করি। ফের ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিই...হুঁশ ফিরলে দেখি চাঁদের ফরসা আলোয় শান্তনু আমাকে হাঁ করে দেখছে। অস্বস্তি বোধ করে শাড়ি ঝেড়ে ফের নিচে বসলে, শান্তনু বলে, কে বলেছে তুই মরে যাচ্ছিস ? তোর ভেতর গোপন তলায় তুই আগের তোকেই পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিস। আমি সেই পাথরটা সরাবই।

ফের নিঃসঙ্গতা।

আচমকা আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, আমি হড়হড় করে বলি, বিয়ের কথা হয়েছে বলেই আমরা প্রেমিক-প্রেমিকার মতো কথা বলব, তা হবে না, আমরা তদ্দিন যেমন বন্ধু ছিলাম, তেমনই থাকব।

দু'হাত দিয়ে জোনাকি সরিয়ে শান্তনু বলে, তবে শর্ত একটাই। এদ্দিন আমি শুধু মিতুলের সঙ্গে কথা বলে গেছি, তোমার সঙ্গে কালেভদ্রে। এখন থেকে আমিও নিয়মিত তোমাকে ফোন দেব, ব্যাপারটা নিয়ে মিতুলের সঙ্গে রফা করে নেব আমি।

আচমকা হুঁশ হয়, রিসিভার ঘাস মাটিতে পড়ে আছে, প্রায় চিৎকার করি, তুমি নীলুর সঙ্গে কথা বলো নি ? বলে ছটফট করতে করতে ফোনটা কানে নিই। নীলু হাসছে, খুব তো আমার ফোন রেখে জম্পেশ প্রেম করছ, আর আমাকে কত কী-ই না বুঝাচ্ছ, ঠিক আছে, শান্তনু তোমার পাথরটা সরালেই হবে, আমি আর কিছু চাই না। তা তোমরা যাবে কখন ওখানে ? আমি ওর কথায় এমন বিব্রত বোধ করি, সহসা কথা বলতে পারি না, একটু থেমে বলি, শান্তনু ওঠো, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, নীলু তুমি আসো, আমরা যাচ্ছি।

১৯

আমি ও শান্তনু পৌঁছানোর কিছু পরেই ভাগ্যিস নীলু আর মিতুল আসে। সুলতানাকে সব বলেছে নীলু, ওর ব্যবহারেই বোঝা যায়। সুন্দরভাবে সাজানো ড্রয়িংরুমের দুই কোণে লাগানো দুটো বনসাই ঘরের আশ্চর্য সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

দুদিন পরে পরেই রোদ খাইয়ে নিয়ে আসি, সুলতানা হেসে বলে।

মিতুল ঘরে ঢুকে জড়তা নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, এরপর শান্তনুর সামনে গিয়ে কান ধরে দাঁড়ায়। শান্তনু তাকে আগলে ধরে, পাগল মেয়ে। মিতুল রংতুলি শিট আগেই টেবিলে রেখেছিল, এইবার শান্তনুর পাশে গিয়ে বসে।

সুলতানা এঘর-ওঘর করছে।

সিম্পল খাবার কর, আমি বলি, আমরা তোর সঙ্গ চাই, তুই এখানে এসে বোস।

এই তো হয়ে গেছে, হাত মুছতে মুছতে সুলতানা এসে সোফায় বসে।

নীলু আচমকা দাঁড়ায়, মিতুলের দিকে এগিয়ে যায়, এখানে আমরা বড়রা আড্ডা দেব। এখানে তোমার বয়সী আরও দুটি বাচ্চা আছে, তুমি ওদের সঙ্গে খেলতে পারো, আড্ডা দিতে পারো।

আমি বাচ্চা নই, দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করে মিতুল।

আমাদের মতো বড়ও নও, নীলুর কণ্ঠে উষ্মা। তুমি বাড়িতে কী বলে এসেছিলে ?

আমি তো বলি নি আমি ছবি আঁকব না, এরপর সুলতানার দিকে তাকায়; আমি কোথায় গিয়ে আঁকব, জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন আন্টি ?

আমার হাতে হাত ছুঁইয়ে আমাকে অতল ভালোলাগায় ডুবিয়ে সুলতানার সঙ্গে ভেতরে যায় মিতুল।

ঘরটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে।

সুলতানা ফিরে আসে, আর বোলো না, স্কুলের ক্লাস নাইনের একটা মেয়ে বয়েজ স্কুলের একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে। গার্জেনরা এসে স্কুলটাকে মাথায় তুলে নিচ্ছিল।

ব্যাপারটা আমি জানি। চুপ হয়ে থাকি।

সব কটা পেকে গেছে, নীলু বলে, আমি ফাইভের মেয়ের পালানোর গল্পও শুনেছি। কী শান্তনু তুমি এমন ঝিম মেরে আছ যে ?

শান্তনু অস্ফুটে বলে, উপভোগ করছি। আমার মনে হচ্ছে ভার্সিটির ক্লাস সেরে আমরা কোথাও একটা স্থানে বসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন নস্টালজিয়ায় পড়ে যাই। সুলতানা বলে, এদ্দিন পর শান্তনুকে কাছ থেকে দেখছি তো, এক কণাও বদলায় নি বরং যে আবেগগুলো মেয়েদের বেশি থাকে সেগুলি ওর মধ্যে ঠাসা। সারাক্ষণ অতীতের গল্প বিশেষ করে ভার্সিটির গল্প করে।

গৃহপরিচারিকা সমুচা ভাজা, ফ্রেঞ্চফ্রাই, আর চা নিয়ে আসে।

আহা! চা-টা পরে আনলেই পারতি, ঠান্ডা হয়ে যাবে।

কী দিন ছিল, শান্তনু নিজ ঘোরেই আবর্তিত, ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স না পেয়ে আমি জাহাঙ্গীরনগরে আসি। সুলতানা, মিলি দুজনেই চান্স পেয়েও আমার পিছু পিছু জাহাঙ্গীরনগরের পথ ধরে।

এই একদম না, সুলতানা আর আমি সমস্বরে চিল্লাই, চান্স পাওয়ার পর এক বন্ধুর সোর্সে জাহাঙ্গীরনগরে গিয়ে ওখানকার প্রকৃতির প্রেমে পড়ে যাই।

মনে হচ্ছিল না, আমাদের শান্তিনিকেতন ? তবে তোমার ব্যাপারটাই নীলু সবচেয়ে ঝাক্কাস! বান্দরবানের মেয়ে হয়েও চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে না পড়ে জাহাঙ্গীরনগরে এসেছ।

আমার ব্যাপারে ওটাও অনেকটা মিলিদের মতো। আমি অতিথি পাখিদের সিজনে এসে হাঁ হয়ে ছিলাম। নানা রঙের শত শত পাখি ক্যাম্পাসটাকে স্বপ্নপুরী বানিয়ে ফেলেছিল।

ওরা ক্যাম্পাসে আসত না।

ওই যেখানেই ছিল। আমার তো বাবা ছিলেন না, মা'র সঙ্গে অনেক হুজ্জোত করে এসেছিলাম। এরপর টিউশনি করে চলেছি।

অঙ্কে তুমি বরাবরই ভালো।

আমার কথা ছিনিয়ে নিয়ে নীলু বলে, আমরা আলাদা আলাদা সাবজেক্ট হয়েও কেমন করে এক জোট হয়ে চলতাম, সবাই তাজ্জব হতো।

ভার্সিটিতে ঢোকার আগে আগেই শান্তনুকে বৈরাগী বানিয়ে দিয়ে মিলি জিতুর প্রেমে পড়ল, সুলতানার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়েছে বলে বেচারি সঙ্গে সঙ্গে নার্ভাস হয়ে যায়।

মাঝখানে জমে পড়া ধূমল কুয়াশা শান্তনুই কাটিয়ে দেয়, এতে অস্বস্তির কী আছে, সুলতানা তো সত্যি কথাই বলেছে।

তুমি তো দিব্যি মিলির সঙ্গে কাটিয়ে ইয়ার্কি করতে, তুমি যে মিলির কাছে ছ্যাক খেয়ে ভেতরে বৈরাগী হয়ে বসে আছ এ তোমাকে দেখলে কল্পনাই করা যেত না, নীলু বলে, ছুপা রুস্তম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন পরাজিতকে রুস্তম বললে, হাসে শান্তনু, টাইটেলটা ঠিক হলো না।

আমার চোখে ধরা পড়েছিল, নিঃশ্বাস টেনে সুলতানা বলে, ক্যাম্পাসে জিতু এসেছিল, ফড়িঙের মতো উড়ছিল মিলি। শান্তনু চোখে জল নিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে দেখছিল ওদের। আমি কখন ওর পাশে গিয়ে বসেছি, ও খেয়ালই করে নি। আচ্ছা শান্তনু, তোরা শৈশব থেকেই বরকনে হয়েছিস, তোদের পরিবার তোদের বিয়ে চায় জানতি, বন্ধুর মতো একসঙ্গে চলতি, তারপরও মিলিকে জিতুর দিকে যেতে দেখে তুই কোনো ভূমিকা নিলি না কেন ?

বাদ দে তো এইসব কথা।

চোখের সামনে ঘূর্ণায়মান আলোছায়ার প্রচ্ছায়া, মিষ্টি একটা ঘ্রাণ আসছে কোত্থেকে যেন, আমি সিরিয়াস কণ্ঠে বলি, বড় হয়েও আমার প্রতি যে শান্তনুর ক্র্যাশ আছে, আমিও একদম বুঝি নি। দুর্দান্ত অভিনয় জানে ও, বলতে বলতে কাঁটাচামচ দিয়ে সমুচার পাশে বসে থাকা শিঙাড়ার পেট ফুঁড়ে আলু বের করি। আসলে অতীতগুলো যাই থাকুক, বড়ো সুন্দর। আমার আব্বু-আম্মু বেঁচে থাকার সময়গুলো বড়ো স্বর্গীয়। কলেজ পাস দিয়ে ভার্সিটির প্রথম ইয়ারটাও তেমনই ছন্দে যাচ্ছিল, এরপর আমার জীবনে যেন আজরাইল এসে আমার টুটি চেপে ধরল, মন্টু নামের এক রাক্ষসের পাল্লায় পড়লাম। আব্বু-আম্মুর ওম আমাকে নিঃশ্বাস নিতে সাহায্য করেছিল, এরপর তারা দুজন একসঙ্গে... আমার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি ঝরতে থাকে।

তিনজনই লাফ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে, আজ অতীতের ওসব স্মৃতি নিয়ে একদম কোনো কথা না।

আমি নিজেকে বিন্যস্ত করে বলি, আমি কখনো ওইসব স্মৃতি স্মরণ করতে সাহস পাই না। দম বন্ধ হয়ে মরে যাওয়ার দশা হয়, এখন কী করে যে উচ্চারণ করলাম!

নীলু কথা ঘুরিয়ে নেয়, তোর হাসব্যান্ড ফিরতে রাত হবে বলেছিলি, কত দেরি হবে সুলতানা ?

সুলতানা ঠোঁট উল্টে বলে, পুলিশের চাকরি, কিছু আগে এক বাড়িতে চারজন খুন হয়েছে, ওখানে গেছে, কত রাত হবে আল্লাহ মালুম।

চারদিক তাকিয়ে নীলু বলে, শর্টকাটে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বছর দুয়েক পর তুমি শান্তনুকে বিয়ে করবে, এটা পাক্কা ?

সুলতানা বলে, মিতুল ভেতর রুমে ছবি আঁকছে, আমরা অকপটেই কথা বলতে পারি।

এই প্রসঙ্গটা এখন থাক, অস্ফুটে উচ্চারণ করে শান্তনুর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকাই। বলি, বনসাইগুলো কোত্থেকে কিনেছ সুলতানা ?

অনলাইন থেকে।

নীলু বলে, সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে, সারা সন্ধ্যা একসঙ্গে কাটিয়ে মিলি এখনো বলছ, এই প্রসঙ্গ থাক ? তোমার আগের কথা থেকে তুমি দেখি একটু সরছ না। দেরি আছে তো, দু বছর, এত আগে এ নিয়ে কথা বলার কী আছে ?

চায়ে চুমুক দিয়ে সুলতানা বলে, তোমার মনে মনে পাক্কা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য দু-আড়াই বছর কিছুই না।

এর মধ্যে সুলতানা একটা ছোট প্যাকেট এগিয়ে দেয়, জাস্ট একটা লিপস্টিক আর টিপের পাতা, মিনি আয়না আর টুকটাক কয়েকটা জিনিস। কলকাতা গিয়ে অনেকগুলো কিনেছিলাম। তুই রিফিউজ করলে আমি খুব কষ্ট পাব। জানি তুই সাজিস না, কিন্তু তোর জীবন বদলের গল্প যেহেতু এল, একটু একটু করে প্রাকটিস করে দেখতে পারিস। আমি ইতস্তত করতে করতে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফের নানা তর্কবিতর্কে শুরু হয়। যোগ দিই।

আগে হলে আমি এ নিয়ে মহাক্ষিপ্ত হতাম। কিন্তু টানা কদিন যাবৎ তাদের নানা আকুলতা দিয়ে বলা যায় আমার মত আদায় করেছে। আগে কিছুটা আন্দাজ করলেও এভাবে বুঝি নি আজকের আয়োজনটা আমাকে আর শান্তনুকে নিয়ে প্রমিজ করিয়ে পাক্কা সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রোগ্রাম।

আমার মাথার মধ্যে আউলি ঝাউলি লেগে যায়। মন্টু, মা-বাবার পর আমি আত্মা থেকে কখনো হাসতে পারি নি। স্কুলেও নিঃশব্দে যাই, ম্যাডামদের সঙ্গে সরল আন্তরিক হাই হ্যালো হয়, জস্পেশ আড্ডা থেকে আমি হাজার মাইল দূরে। কিন্তু সেদিন সুলতানারা আমার বাসায় আসার পর আর আজকে নিজের খোলস ভেঙে মহা আন্তরিকতায় রীতিমতো বকবক করে আড্ডা দিচ্ছি।

কেবল শান্তনুর বিষয়টা আসায় আমি নৌকার লাগাম হারিয়ে ফেলেছি। ওদের মোটামুটি কথা দেওয়ার পর আজ আমি তীব্র কণ্ঠে কিছুই বলতে পারছি না। হ্যাঁ বলার কথা পাকা ভাবলে শিরশির করে আমার সত্তা। মনে হয় আমাকে উন্মোচন করে আমার দেহে কামড়ের দাগ দেখে ভয়ে শান্তনু পিছিয়ে যাবে।

তা না হয়ে, শান্তনু যখন আমাকে জাগিয়ে ভেতর যেতে চাইবে, মন্টুর দেওয়া সেই বীভৎস ছাপের কথা ভেবে আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব।

নীলু আমাকে বুদ্ধি দিয়েছে বিয়ের দিন এগিয়ে আসার অনেক আগে থেকেই আমরা যেন কাউন্সিলরের কাছে যাই। ত্রিকাল বেয়ে যেন কথার কোরাস নয়, ঝাঁক ঝাঁক পাখিদের সশব্দ ডানা ঝাপটের শব্দ এগিয়ে আসছে।

আমার আত্মার কুণ্ডলী বেয়ে ভীতিকর ছায়াগুলো সরে যেতে থাকে।

কোথায় ডুবলি ? সুলতানা জিজ্ঞেস করে।

ভূতল থেকে বেরোই, আমরা ডিনার করব না ?

আগে মূল ব্যাপারটা ক্লোজ করি, নীলু তুমি যেন কী বলতে চাইছিলে, খুলে দাও।

আরে জানিস না, এই যে মিলি শান্তনু এত ভড়ং করছে, পাহাড়ে গিয়ে নির্ঘাত দুজন পাকা সিদ্ধান্তে এসেছে।

ওদের ফোনটা মাটিতে পড়েছিল, শান্তনু মিলিকে বলছিল আমি তোমার বুকে বসা পাথরটা সরাবই, আর—।

নীলু থামবে ? শান্তনু মিষ্টি করে ধমক দেয়।

এই ব্যাপার ? সুলতানা লাফাতে থাকে। এই নীলু চলো আমরা একটা প্ল্যান করি, দু-আড়াই বছরের ব্যাপারটা তো রইলই, আমরা এর মধ্যে ওদের গোপনে কাবিন করিয়ে ফেলি। যদ্দিন ওরা এতে রাজি হবে না, আমরা ওদের মাথা খেতে থাকব, এরপর মিতুল বিদেশ গেলে ঘরোয়াভাবে এদের বিয়ে করিয়ে দেব।

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাতে যাব, ওমনি দরজা থেকে ভূকম্পনের মতো একটা চিৎকার ভেসে এল, ডাইনি!

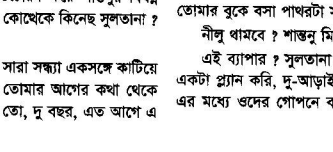

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতুল এখানে কতক্ষণ দাঁড়ানো, আমাদের খেয়ালের মধ্যে ছিল না। এই জন্যই আমাকে বিদেশ পাঠানো ?

ফ্রেন্ড শান্তনু আমাকে ভালোবাসে বলেছে, যে যাকে ভালোবাসে তাকেই বিয়ে করে, এত বছর ওর আমার সঙ্গে ভাব, তোকে তো ও ফোনই করত না, আজ পাহাড়ে প্রেম করতে গেছিলি ? বলে যেন একটা ঝড়ো বাতাস উড়ে গেল ভেতর ঘরে, আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি। ফের উড়ে এসে হাত ভর্তি পেইন্টিংয়ের কালো কালি নিয়ে ছুটে এসে আমার মুখে মাখতে থাকে। সবে এল আমার জীবনে ভালোবাসা, তুই তাকে তোর এই রূপ দিয়ে ফের তাকে পটিয়ে ফেললি ? এতই যদি টান, যখন বিয়ের কথা হয়েছিল তখন করলি না কেন ? এখন আমার সতিন হওয়ার সাধ জেগেছে ? বলতে বলতে সাজাবে কাঁদতে থাকে মিতুল।

এমন একটি দৃশ্যের ভয়াবহতায় স্ট্যাচু বনে যাওয়া মানুষগুলো নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলে।

আমি ট্যানেলে দিয়েছি চিৎসাঁতার, আত্মার পাঁজর ফুঁড়ে অগ্নি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তীব্র বেদনারাশি ঝাঁক ঝাঁক বিছার মতো আমাকে ছেয়ে ফেলে। মন্টু চলে গিয়ে হুবহু আরেকটা মন্টুকে দিয়ে গেছে আমার হৃৎপিণ্ড চিবিয়ে খাওয়ার জন্য। কেবল আমি বুঝি নি। ওর ব্যাপারে অন্ধ থেকেছি।

এরপর প্রগাঢ় নিঃশব্দ ভেঙে শান্তনুর মিতুলকে দেওয়া থাপ্পড়ের শব্দ ভেসে আসে, অসভ্য, জংলি।

এইবার আমার পা উড়ন্ত।

যেন বাতাসে ভেসে রাস্তায় গিয়ে টমটমে উঠি, সবার ডাক উপেক্ষা করে। চারপাশের সার সার বাতাস না, যেন মন্টুর অট্টহাসি।

মাতালের মতো ঘরে ঢুকে পাগলের মতো হাতড়ে হাতড়ে ব্লেড বের করি। এরপর দরজার ছিটকিনি ভালো করে লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

২০

আমি কে ? মহা অতল গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে উচ্চকিত হতে থাকি। সেখানেও সেভলনের গন্ধ আমার মগজের কোষ এলোমেলো করে দেয়।

আমি কোথায় ?

মাথার মধ্যে কালো কালো কেঁচো কিলবিল করে। ধীরে ধীরে স্মৃতি কাজ করতে থাকে। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, আমার দেহ শিথিল হয়ে এসেছিল। ধীরে ধীরে চোখের পাপড়ি খুলতে গিয়ে একটা মিহি ক্রন্দনের সঙ্গে পায়ের কাছে পড়ে থাকা কারও বাক্যাবলী শুনে পাই, মা তুমি ফিরে আসো, তুমিও যদি নানা-নানুর কাছে চলে যাও আমি গলায় দড়ি দেব...।

মিতুল না ? এইবার ওর এই কান্না আমার অবসন্ন দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়, আমাকে একবার মাথায় তুলে ফের অতল পাহাড় থেকে নিচ দিকে ফেলে দেওয়ার খেলা—মিতুলের এই নাটক বাজিতে আমি আর ভুলব না। ও স্রেফ একটা মন্টু, ওর মুখে কোনো মায়ার আদল নেই, আমি এদ্দিন নিজেকে শান্ত রাখতে এসব নিয়ে নিজেকে বুঝ দিয়ে রেখেছি।

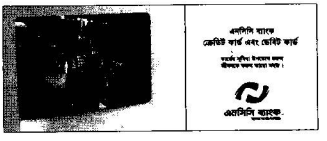

আমার মুখটা কালিতে ভরে যায়। দৃঢ় হয়ে ওঠে আমার শরীর, বেঁচে গেলাম ? আবার সেই জীবন্মৃত জীবনের ঘানি টানতে হবে ?

মা, আমাকে সবাই বকছে, ঘেন্না করছে, কথা বলা বন্ধও করেছে। তোমাকে কত অপমান করেছি, তুমি কোনোদিন এসব করো নি। আমি এইচএসসির আগেই অনেক দূরে চলে যাব। আমাকে আমার বিশ্বাস নেই। আমি সব জানি, আমি তোমার কাঙ্ক্ষিত ছিলাম না। একটা অসভ্য যন্ত্রণার মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে, তাও তুমি আমাকে কত পরম স্নেহই না করেছ। তুমি নিজের মতো যেভাবে খুশি বাঁচো। মা ফিরে এসো... হেঁচকি উঠতে থাকে। আমাকে ত্যাজ্য করো, তাও, মা যেয়ো না। এখন গভীর রাত। তোমার কাছে কেউ আমাকে আসতে দিচ্ছিল না। আমি লুকিয়ে এসেছি মা... মা...।

মিতুলে গলা ভেঙে যেতে থাকে।

আমার পুরো বোধে অদ্ভুত এক নির্বিকারত্ব কাজ করে, বুকের ব্যথাটা যাচ্ছে না। আমার করোটির জলে ভেসে বেড়ায় বিচিত্র সব মাছ। আমার মরদেহ ঠেলতে ঠেলতে কারও মুখে যেন ফেনা উঠে যাচ্ছে।

ছটফট করে উঠি, না আমি মরি নি। সৃষ্টিকর্তা আমাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছেন। এই জীবনের প্রতিটি অক্ষর দিয়ে আমি আমাকে ভালোবাসব। দীর্ঘ নীরবতা।

অনেকক্ষণ নীথর থেকে নাক থেকে অক্সিজেনের যন্ত্রটি খুলে ধীরে ধীরে নিজেকে টেনে তুলতে থাকি। মাথাটা টলছে। বসে দেখি, কাঁচুমাচু হয়ে মিতুল ঘুমিয়ে আছে। আগে হলে এই মায়াময় অবয়বটিকে আমূল জড়িয়ে ধরতাম। কিন্তু আজ ওকে নিয়ে কোনো বোধ কাজ করছে না। নার্সও ঢুলছে।

ঘরের মধ্যে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। নামতে গিয়ে কাঁপতে থাকি। আমার দেহের শক্তি স্ট্রু দিয়ে কেউ টেনে নিয়েছে। আমার মুখে অসভ্য রঙের রংতুলি আছড়ে আছড়ে মারছে কোনো ডাইনি, কম্পিত শরীর ঝাঁকি দিয়ে ওঠে।

জানালার দূর সীমানা ধেয়ে ধেয়ে বুদবুদের মতো কিছু একটা প্রগাঢ় অনুভব আমাকে চারপাশ থেকে ছেকে ধরে।

বিয়ের পর থেকে আমি কোনোদিন নিজেকে একফোঁটা ভালোবাসি নি। আমার রগ কাটা অধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সেই অধ্যায়কেও সমূলে কেটে ফেলি। সত্যিই তো আমার জীবন, আমার যৌবন সবই তো বৃথার মহানির্দয়ায় ভেসে যাচ্ছিল।

আমি স্পষ্ট একটি নদী দেখি, তার ওপর অসংখ্য ঢেউ দেখি, ভেজা কাপড়ের আমাকে শায়িত। দেখি, একটি ঝাঁকড়া যুবকের মুখ দেখি... ক্রমশ সেই মুখ সরে অন্য একটা মুখ স্থাপিত হয়, আমি তোমার বুক থেকে সেই পাথর সজোরে সরিয়ে ফেলব।

এইবার মরিয়া হয়ে নিজেকে উঠিয়ে দেয়াল ধরে ধরে বাথরুমে যাই।

শাওয়ার উপচে পানি পড়ছে। আমি দীর্ঘক্ষণ ভিজি। দুর্বল শরীরটা পড়ি পড়ি করে, আমি নিজেকে টাল সামনে টেনে টেনে তুলি।

বেরিয়ে এসে দেখি মাথার এক পাশে আমার ব্যাগ। সুলতানার দেওয়া জিনিসগুলো বের করি। কত দিন পর, কত অনন্তকাল পর আয়নাটাকে কব্জায় নিয়ে কম্পিত হাতে নিজের কপালের ওপর একটি টিপ বসিয়ে দিই। ০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~